পাক্ষিক

ان الدين عند الله الاسلام

আহমদী

মানব জাতির জন্য জগতে আজ কুরআন ব্যতিরেকে আর কোন ধর্মগ্রন্থ নাই এবং আদম সন্তানের জন্য বর্তমানে মোহাম্মাদ মোস্তফা (সাঃ) ভিন্ন কোন রসূল ও শেফায়াতকারী নাই। অতএব তোমরা সেই মহা গৌরব-সম্পন্ন নবীর সহিত প্রেমসূত্রে আবদ্ধ হইতে চেষ্টা কর এবং অন্য কাহাকেও তাঁহার উপর কোন প্রকারের শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করিও না।"

—হযরত মসীহ মওউদ (আঃ)

সম্পাদক :— এ, এইচ, মুহাম্মদ আলী আনওয়ার

নব পর্যায়ের ৩৩শ বর্ষ : ৭ম সংখ্যা

২৯শে শ্রাবণ, ১৩৮৬ বাংলা : ১৫ই আগষ্ট, ১৯৭৯ ইং : ২১শে রমযান, ১৩৯৯ হিঃ

বার্ষিক : চাঁদা বাংলাদেশ ও ভারত : ১৫'০০ টাকা : অন্যান্য দেশ : ৫ পাউণ্ড

'ঈদুল ফিৎর সংখ্যা'

সূচীপত্র

পাক্ষিক ৩০শে জুলাই ৩৩শ বর্ষ
আহ্‌মদী ১৯৭৯ ইং ৭ম সংখ্যা

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
● তফসীরুল-কুরআন : তফসীরুল কুরআন	মূল : হযরত খলিফাতুল মসীহ সানী (রাঃ) অনুবাদ : মৌঃ মোহাম্মাদ আমীর, বাঃ আঃ আঃ	১
● হাদিস শরীফ :	অনুবাদ : এ, এইচ, এম, আলী আনওয়ার	৫
○ এতেকাফ ও লাইলাতুল কদর :	অনুবাদ : মৌঃ আহমদ সাদেক মাহমুদ	৬
● অমৃতবাণী : "রোজার অপরিহার্যতা ও তাৎপর্য্য"	হযরত ইমাম মাহ্‌দী ও মসীহ মওউদ (আঃ) অনুবাদ : মৌঃ আহমদ সাদেক মাহমুদ	৭
● ঈদুল ফিতরের খোৎবা :	হযরত খলিফাতুল মসীহ সানী (রাঃ) অনুবাদ : মৌঃ আহমদ সাদেক মাহমুদ	৮
● হযরত ইমাম মাহদী (আঃ)-এর সত্যতা :	হযরত মীর্যা বশীরুদ্দীন মাহমুদ আহমদ, খলিফাতুল মসীহ সানী (রাঃ) অনুবাদ : মোহাম্মদ খলিলুর রহমান	১৯
○ সংবাদ :		২২

পবিত্র ঈদুল ফিতর উপলক্ষে পাক্ষিক আহ্‌মদীর পক্ষ হইতে আমরা সকল পাঠক-পাঠিকার খেদমতে আন্তরিক 'ঈদ মোবারকবাদ' পেশ করিতেছি।

وعلى عبده المسيح الموعود نحمده ونصلي على رسوله الكريم

পাক্ষিক

আ হ ম দী

নব পর্যায়ের ৩৩ বর্ষ : ৮ম সংখ্যা

১৯শে শ্রাবণ, ১৩৮৬ বাংলা : ১৫ই আগষ্ট, ১৯৭৯ইং : ১৫ই জহুর, ১৩৫৮ হিজরী শামসী

HOMI LIBRARY
339 PIRERBUG
MIRPUR
DHAKA—1210
ZILLUR RAHMAN KHAN

'তফসীরুল কুরআন'—

সুরা আল-কাফেরুন

(হযরত খলিফাতুল মসীহ সানী (রাঃ)-এর 'তফসীরে কবীর' হইতে সুরা আল-কাফেরুনের তফসীর অবলম্বনে লিখিত)—মৌঃ মোহম্মদ, আমার বাঃ আঃ আঃ

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

এই সুরার ফজিলত সম্বন্ধে জুবের বিন মোতএম (রাঃ) হইতেও এক বর্ণনা আছে যে হযরত রসুল করীম (সাঃ) জুবের (রাঃ)-কে বলেন, "হে জুবের! তুমি কি পছন্দ কর যে, যখন তুমি সফরে যাও, তখন তোমার মুখমণ্ডল হইতে সর্বাপেক্ষা বেশী জ্যোতি বিচ্ছুরিত হয় এবং সর্বাপেক্ষা বেশী পথের সম্বল তোমার সহিত থাকে?" জুবের (রাঃ) বলেন, "হে আল্লাহর রসুল। হাঁ!" হযরত রসুল করীম (সাঃ) বলিলেন, "তাহা হইলে তুমি সফরে এই পাঁচটি সুরা পাঠ করিবে—যথা, সুরা কাফেরুন হইতে সুরা নাস পর্যন্ত" বস্তুতঃ সুরা কাফেরুন হইতে সুরা নাস পর্যন্ত ৬টি সুরা আছে। মনে হইতেছে হুজুর (সাঃ) সুরা তাববাত ইয়াদাকে গুনতি হইতে বাদ দিয়াছেন অথবা সুরা কাফেরুনের পরবর্তী ৫টি সুরাকে তিনি গণনা করিয়াছেন অথবা বর্ণনা করিতে ভুল করিয়াছেন। মোট কথা এই হাদীসের মর্ম হইল সুরা কাফেরুন সহ ছয় সুরা অথবা সুরা কাফেরুনকে বাদ দিয়া ৫টি সুরা।

পুনঃ হযরত রসুল করীম (সাঃ) বলিয়াছেন যে বিসমিল্লাহের রহমানে রাহিম পড়িয়া তেলাওয়াত আরম্ভ কর। এতদ্বারা ইহা প্রমাণিত হয় যে, বিসমিল্লাহ আয়াত সুরার একাংশ। জুবের রাঃ বলিয়াছেন যে তিনি ধনবান ছিলেন না এবং সফরকালে সঙ্গীগণের মধ্যে তাঁহার অবস্থা সর্বাপেক্ষা খারাপ হইত এবং তাঁহার নিকট পাথেয় সকলের চেয়ে কম থাকিত। তিনি বলিয়াছেন, "কিন্তু অতঃপর উপরোক্ত সুরাগুলি পাঠের ফলে আমার অবস্থা আমার সঙ্গীদের চেয়ে ভাল হইয়া গেল এবং পথের সম্বল সকলের থেকে আমার নিকট বেশী থাকিত।"

ইহাতে কোন সন্দেহ নাই যে কুরআন করীমের সুরা পাঠে বরকত আছে। যে ব্যক্তি কুরআন পাঠ করে, আল্লাহতায়ালা তাহার উপর আপন ফজল নাযেল করিয়া থাকেন। কিন্তু ইহা সত্বেও কথা এই যে উপরোক্ত সুরাগুলির মধ্যে প্রধানতঃ গায়ের মযহবের সহিত মোকাবেলা আছে এবং নিজেদের দুর্বলতা সমূহকে দূর করার জন্য মনোযোগ আকর্ষণ করা হইয়াছে, বিপদাবলীর সময়ে ধৈর্য অটল থাকিতে বলা হইয়াছে, তৌহীদের উপর গুরুত্ব দেওয়া হইয়াছে। মানুষ এই কথাগুলি যদি বার বার মনে মনে স্মরণ করে, তাহা হইলে তাহার মধ্যে উপাদের মধ্যে নিহিত উপদেশাবলী পালনের অভ্যাস গড়িয়া উঠিবে এবং সে ক্রমে মজবুত হইতে থাকিবে। যখন সে উপরোক্ত উপদেশাবলী অনুযায়ী কাজ করিতে থাকিবে, তখন সে বিজাতীদের মধ্যে সম্মান লাভ করিবে এবং স্বজাতির মধ্যে একতা সাধন কারীরূপে গণ্য হইবে। যখন কোন বিজাতি কাহাকেও নিজের প্রভাবে পড়িতে দেখে তখন তাহার সাহস বাড়িয়া যায় এবং তাহার দৃষ্টিতে প্রভাব গ্রহণকারীর জাতির সম্মান নষ্ট হইয়া যায়।

১৯২৪ ইং সনে যখন আমি ইসলামের তবলীগের সুযোগ সন্ধানে ইংলণ্ড সফরে গিয়াছিলাম আমি সেই পোষাকে পরিহিত ছিলাম যাহা নিজ দেশে পরিতাম। আমার পরনে ঢিলা ঢালা সিলওয়ার ও কামিজ ছিল। ইংরেজ জাতি এরূপ পোষাককে শুধু ঘৃণার চোখেই দেখিত না বরং তাহারা এই প্রকার পোষাককে তাহাদের রাত্রি যাপনের পোষাকের অনুরূপই মনে করিত। অন্য কথায় এই রকম পোষাক পরিধান করাকে উলঙ্গ থাকার সামীল মনে করিত, এই জন্য তাহারা রাত্রি যাপনের পোষাক পরিয়া কাহারও সহিত দেখা করিতে বাহির হইত না। একদিন আমাদের মিশনের ইনচার্জ মোবাল্লেগ আমার নিকট আসিয়া দ্বিধা ও সংকোচের সহিত বলিতে লাগিলেন, "হুজুর আপনার এরূপ ঢিলা ঢালা পোষাক দেখিয়া স্থানীয় জনসাধরণের মনে বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হইতেছে, আপনি প্যান্ট না পড়েন অন্ততঃ আলীগড় ফ্যাশনের গরম পাজামা পরিতে পরেন এবং গায়ের কামিজটাকে পাজামের ভিতর ঢুকাইয়া দিতে পারেন।" আমি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "কেন আমি ইহা করিব? আমার জাতীয় পোষাকের বিরুদ্ধে তাহাদের আপত্তি করার কি অধিকার আছে?" মোবাল্লেগ সাহেব বলিলেন, "তাহাদের ইহাতে আপত্তি করার অধিকার থাকুক বা না থাকুক, ইহার দ্বারা মন্দ প্রভাব বিস্তার লাভ করিতেছে এবং জাতীয় অবমাননা হইতেছে।" সেই দিনই লণ্ডনের অরিয়েন্টাল কলেজের প্রিন্সিপল সার ডেনিসন রাস এবং আরও কতেক বড় বড় গণ্যমান্য লোক আমার সঙ্গে সাক্ষাত করিতে আসিলেন। আমি তাহাদের সামনে এই প্রশ্ন রাখিয়াই বলিলাম, "আপনারা কি আমার পরনে এই পোষাককে হেয় চোখে দেখেন?" ইউরোপীয় সভ্যতার কায়দায় তাহারা বলিল, "না, না, ইহা কিরূপে হইতে পারে? আমরা আপনাদের পোষাককে ভাল মনে করি।" আমি বুঝিলাম যে পাশ্চাত্য সভ্যতার রীতি অনুযায়ীই তাঁহারা এরূপ বলিতেছেন ইহা তাহাদের অন্তরের কথা নহে। আমি বিষয়টির উপর গুরুত্ব দিয়া আবার বলিলাম যে, আপনি আমার বিশেষ বন্ধু। সত্য করিয়া বলুন তো, আমার এই পোষাক আপনার স্বজাতির মনে কি প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে? ইহাতে তিনি উত্তরে বলিলেন, "সত্য কথা বলিতে কি, আমাদের দেশের লোক এই পোষাকে জনসাধারণের সম্মুখে আলাকে মন্দ মনে করে এবং ঘৃণার চোখে দেখে।" সার ডোমিসন রাস আলীগড়ে School of Oriental Studies এবং কলিকাতায়ও প্রফেসারের কাজ করিয়াছিলেন। আমি সার ডেনিসন রাসকে বলিলাম, যখন আমাদের দেশে ছিলেন তখন আপনি সিলওয়ার অথবা ধুতী পরিতেন কি? তিনি উত্তরে বলিলেন, 'না।' তখন

আমি বলিলাম, "আচ্ছা, বলুন তো, আপনি আমাদের দেশে গিয়া নিজ জাতীয় পোষাক পড়িলে কোন দোষ হয় না অথচ আমরা আপনাদের দেশে আসিয়া নিজ জাতীয় পোষাক পরিলে দোষ হয়। এ কেমন কথা? ইহার কি এই অর্থ নহে যে আপনারা নিজেদের জাতিকে আমাদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ এবং আমাদের জাতিকে আপনাদের চেয়ে হেয় জ্ঞান করেন? এইজন্যই আপনারা চান যে আমরা আপনাদের অনুসরণে ও অনুকরণে আপনাদের জাতীয় পোষাক পরি অথচ আপনারা বিদেশে গিয়া অনুরূপভাবে সেদেশের পোষাক পরিতে প্রস্তুত নহেন। এমতাবস্থায় একজন জাতীয় আত্মমর্যাদাবোধ সম্পন্ন হিন্দুস্তানী কিরূপে আপনাদের সন্তুষ্টির জন্য তাহার জাতীয় পোষাক বর্জন করিতে পারে?"

পুনরায় আমি তাঁহাকে বলিলাম, "ইহা কি সত্য নহে যে একজন ভারতবাসী যখন কোট, প্যান্ট পরে তখন আপনারা মনে মনে খুশী হন না যে সে আপনাদের জাতীয় পোষাকের শ্রেষ্ঠত্ব মানিয়া লইয়া আপনাদের পোষাক পরিয়াছে?" উত্তরে তিনি বলিলেন, 'সঠিক আকারে মনের মধ্যে এই ভাবের উদ্রেক হউক বা না হউক কিন্তু মস্তিষ্কের পর্দার আড়ালে এই খেয়াল হওয়া স্বাভাবিক এবং হয়" আমি বলিলাম, "অন্য কথায়, ইহাও সাব্যস্ত হয় যে যে ব্যক্তি আপনাদের দেশে আসিয়া তাহার জাতীয় পোষাক ব্যবহার করা ছাড়েনা, আপনারা তাহার উপর রুষ্ট হন এবং ইহাতে আপনাদের জাতীয় অবমাননাও বোধ করেন। আপনাদের মস্তিষ্কে এই খেয়ালও উদয় হয় যে এই ব্যক্তি আমাদিগকে ও আমাদের সভ্যতাকে ভয় করিল না।' ইহাতে কিছুটা বিক্ষুব্ধ হইয়া তিনি বলিলেন, "কথা তো ঠিক।" তখন আমি বলিলাম যে, "আমি ভারত হইতে আসার সময় এখানের ঠাণ্ডা আবহাওয়ার কথা চিন্তা করিয়া আলীগড় ফ্যাশনের কিছু গরম কাপড়ের পাজামা যাহা দেখিতে প্যান্টের ন্যায়, এবং উহার মধ্যে ইজারবন্দও ব্যবহার হয় সিলাই করাইয়াই সঙ্গে আনিয়াছিলাম কিন্তু এখন আর আমি সেই পোষাক পরিব না, এবং উহা ফেরৎ লইয়া যাইব। ইংরেজ জাতি ভারতের উপর হুকুমত করিলেও আমি ভারতবাসীগণকে ইংরেজ জাতি হইতে নিকৃষ্ট মনে করি না, এবং ভারতীয় সভ্যতা ও কৃষ্টিকে ইংরেজ জাতির সভ্যতা ও কৃষ্টি হইতে নীচু মনে করি না। আমি ইংরেজ জাতির কৃষ্টি ও সভ্যতাকে নকল করিতে প্রস্তুত নহি"

আঁ-হযরত (সাঃ) জুবের (রাঃ)-কে এইজন্য এই কথা ফরমাইয়াছিলেন যে, সফরে তুমি এই সুরা পাঠ করিলে তোমার আত্মমর্যাদা বৃদ্ধি হইবে। ইহাতে প্রকৃতপক্ষে এই কথার দিকে ইঙ্গিত করা হইয়াছে যে এই সুরার মধ্যে ইস্‌লামের মূল শিক্ষা পেশ করা হইয়াছে। প্রবল বিরোধিতার মোকাবিলায় দৃঢ় থাকার জন্য উপদেশ দেওয়া হইয়াছে। এবং যে ব্যক্তি ভাষণ বিরোধিতার মধ্যেও স্বীয় মতবাদের উপর দৃঢ় থাকার সাহস দেখায় সে অবশ্যই স্বীয় আত্মমর্য্যাদা ও জাতীয় মর্য্যাদা প্রতিষ্ঠিত করিতে সক্ষম হইবে। এবং ইহাতে তোমার পথের সম্বল বৃদ্ধি হইবে। এইজন্য ফরমাইয়া ছিলেন যে, প্রকৃতপক্ষে, ইহাতে এই কথার ঈঙ্গিত আছে যে, যে ব্যক্তি অপরের নিকট স্বীয় আর্থিক অনটনের জন্য মাথা নত করিবে না, তাহার কখনও এই খেয়াল হইবে না যে, কেহ আমার খোজ-খবর রাখুক এবং কেহ আমাকে সাহায্য করুক এবং যখন সেই ব্যক্তি অপরের নিকট আর্থিক সাহায্য পাওয়ার আকাঙ্খা হইতে নিজেকে মুক্ত রাখিবে, তখন অবশ্যই সেই ব্যক্তি হালাল ও আত্ম মর্য্যাদা সম্পন্ন উপার্জ্জনের প্রচেষ্টা করিবে।

হায়! যদি আমাদের নব্য যুবকগণ পাশ্চাত্য দেশ সমূহ সফর কালীন অবস্থায় এই সুরাগুলি পাঠ করিত এবং উহাদের মর্মার্থের প্রতি মনোনিবেশ সহকারে চিন্তা করিত তাহা হইলে কুফরী শক্তির দুষ্ট প্রভাব কখনও তাহাদের উপর ক্রিয়াশীল হইতে পারিতনা। নিজেদের অসহায়ত্ব, অমর্যাদা ও জাতীয় হীনমান্যতা বোধের মৌতিক দুর্বলতা তাহাদের অন্তর হইতে দূর হইয়া যাইত। সত্য কথা ইহাই যে, মানুষ বাহ্যিক পরিবেশের দ্বারা সেইরূপ প্রভাবান্বিত হয়না যেরূপ সে পরাজিত মনোভাবের দ্বারা হইয়া থাকে। বাহ্যিক পরিবেশকে বদলান সহজ কিন্তু পরাজিত মনোভাবকে বদলান বড়ই কঠিন কাজ। এশিয়াবাসীদের অর্থনৈতিক অবনতি সত্বেও বহু লক্ষপতি ও কোটিপতি বিদ্যমান আছে কিন্তু পরাজিত মনোভাবের কবল হইতে অল্প লোকই নিরাপদ আছে। ইউরোপের সহিত শক্ত প্রতিযোগিতা সত্বেও আমরা ধন-সম্পদ অর্জনে সক্ষমও হইয়াছে। কিন্তু আমাদের মনোভাবকে তাহাদের আক্রমণ হইতে রক্ষা করিতে পারি নাই এবং ঈদৃশ পরাজিত মনোভাবের সংশোধনের প্রতি আলোচ্য সুরাগুলিতে মনোযোগ আকর্ষণ করা হইয়াছে এবং ইহার উপাদান সমূহ সুরা গুলিতে বর্ণনা করা হইয়াছে।

সুরা কাফেরুনের আর এক নাম مقشقشان (মোকাশ কাশান)। আছমায়ী বলেন, প্রথম জমানার বুজুর্গগণ (অর্থাৎ তাবেয়ী এবং সাহেবা কেরাম (রাঃ) বলিতেন যে সুরা 'কাফেরুন' এবং সুরা 'এখলাস' আমাদিগকে 'নেফাক' অর্থাৎ ভণ্ডামী হইতে রক্ষা করে এবং ঈমানের শক্তি সৃষ্টি করে। আবুওবায়দা (রাঃ) বলিতেন, যেভাবে ال (রাল) আলকাতরা) চুলকানী ভাল করিয়া দেয় সেইভাবে এই সুরাদ্বয় মানুষকে 'শেরক' হইতে আধ্যাত্মিক সুস্থতা দান করে।

ওয়াক্তে নজুল (অবতীর্ণ হওয়ার সময়)

ইউরোপিয়ান প্রাচ্যবিদ নভেলডেকের মতে এই সুরা আঁ-হযরত (সাঃ)-এর মক্কা জীবনের প্রাথমিক পর্য্যায়ের শেষের দিকের অর্থাৎ তাঁহার নবুওত লাভের চতুর্থ বৎসর পূর্ণ হওয়ার নিকটবর্তী সময়ে নাজেল হয়। ইহার কারণ এই দর্শান যে, আঁ-হযরত (সাঃ) তখন মক্কার কাফেরদের নিকট স্বীয় মতবাদের যুক্তিতর্ক পেশ করিবার যোগ্যতা লাভ করিয়াছিলেন। মুসলমান ও মোশরেকদের মধ্যে স্ব স্ব মতবাদ সম্পর্কে ধর্মীয় আলোচনা ও মত বিনিময়ের প্রথম পর্য্যায় শেষ হওয়ার পর দুই সম্প্রদায়ের মৌলিক চিন্তা-ধারা সুনির্দিষ্ট হইয়া গিয়াছিল এবং এই সময়ই প্রকৃতপক্ষে ধর্মী মতবাদ দৃঢ়তার সহিত প্রচার করার ঠিক সময় হইয়া থাকে

নভেলডেকের এই ধারনা এতখানি পর্য্যন্ত সটিক যে, যে কোন ধর্মীয় মতবাদের প্রাথমিক অবস্থায় যেহেতু উহার পেশ করা যুক্তি-প্রমাণ সদৃহ নূতনত্বের কারণে অস্বীকার-কারীগণ যথাযথ ভাবে উপলব্ধি করিতে পারেনা, সেই জন্যই উহার আলোচনা তৎকালে ভাসা ভাসাই হইয়া থাকে। নূতন ধর্ম গ্রহণকারীগণ ধীরে ধীরে মত বিনিময়ের পর নিজেদের কথাগুলিকে নির্দ্দিষ্ট রূপে পেশ করার যোগ্যতা লাভ করে এবং বিরুদ্ধবাদীগণও নিজেদের এলোমেলো মতকে এক নির্দ্দিষ্ট রূপ দিয়া থাকে। অতঃপর এক নূতন আন্দোলন যাহা এক পুরাতন জরাজীর্ণ আন্দোলনের স্থান অধিকার করার জন্য সৃষ্ট হইয়া থাকে, উহার ঘোষণার কয়েক বৎসর পরে লোকেরা নির্দ্দিষ্টও যুক্তিযুক্ত ধারায় উভয় মতবাদের তুলনা মূলক ভাবে যাচাই করার যোগ্যতা অর্জন করে। এবং এই সুরার মধ্যে বিরুদ্ধ বাদীগণকে এক অকাট্য চ্যালেঞ্জ দেওয়া হইয়াছে, এই জন্য নভেলডেক এই আভ্যন্তরীণ সাক্ষ্যের ভিত্তিতে এই সিদ্ধান্ত করিয়াছে যে এই সুরা আঁ-হযরত (সাঃ)-এর নবুওত জিন্দেগীর প্রাথমিক পর্য্যায়ের শেষ দিকে নাযেল হইয়াছে।

(ক্রমশঃ)

হাদিস শরীফ

মৃত্যু ও মৃত ব্যক্তির আত্মীয়গণের নিকট সমবেদনা প্রকাশ

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

৩৬৫। হযরত উস্‌মান বিন অফফান রাযিয়াল্লাহু-তায়ালা আনহু বলেন "আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম যখন মৃতের দাফন হইতে ফারেগ হইতেন, তখন তাহার কবরে দাঁড়াইয়া ফরমাইতেন : তোমাদের ভাইয়ে জন্য দোষ-ত্রুটি স্খলনের জন্য দোয়া কর। তাহার পদ দৃঢ়ীভূত হওয়ার জন্য দোয়া কর কারণ, এখন তাহার 'সাওয়াল জবাব' শুরু হইবে।

['আবুদ দাউদ, 'কিতাবুল জানায়েয, বাবুল ইস্তেগফার ইন্দাল কাবরে লেল-মাইয়্যেতে ফি ওয়াক্তিল ইনসিরাফে; ২ : ৪৫৯ পৃঃ]

৩৬৬। হযরত আবু হুরাইরাহ রাযিয়াল্লাহ-তায়ালা আনহু বলেন যে, আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম ফরমাইয়াছেন : "যখন মানুষ মরিয়া যায় তখন তাহার 'আমল" (কর্ম) শেষ হইয়া যায়। কিন্তু তিনটি আমল শেষ হয় না। এক, 'সাদকা জারিয়া' এরূপ দান যাহার কল্যাণ মানুষের মৃত্যুর পরেও জারী থাকে)। দ্বিতীয়, এরূপ জ্ঞান বা বিদ্যা, যদ্দারা মানুষ উপকৃত হইতে থাকে। তিন, এরূপ সুসন্তান, যাহারা তাহার জন্য দোয়া করে "

(মুসলিম, কিতাবুল ওয়াসিয়াত, বাবু মা ইউল্‌হাকুল ইনসানু মিনাস্‌ সাওয়াবে বায়া'দা ওফাতিহী ; ১-২ : ৬৭ পৃঃ)

৩৬৭। হযরত আনাস্‌ রাযিয়াল্লাহু-তায়ালা আনহু বলেন যে, লোকে এক জানাযা লইয়া যাইতেছিল। সেখানে যে সব সাহাবা বসা ছিলেন, তাঁহারা তাহার প্রশংসা করিলেন। ইহাতে তিনি (সাঃ) ফরমাইলেন, "ওয়াজিব হইয়াছে।" অতঃপর, আরো এক জানাযা অতিক্রম করিল। লোকে তাহার নিন্দা করিল। হুযুর (সাঃ) ফরমাইলেন, "ওয়াজিব হইয়াছে।" হযরত উমর (রাঃ) পার্শ্বেই বসা ছিলেন ; নিবেদন করিলেন, "হুযুর (সাঃ)। কি ওয়াজিব হইয়াছে ?" ফরমাইলেন : "তোমরা যাহার প্রশংসা করিয়াছ তাহার জন্য জান্নাত (বেহেশত) অবধারিত হইয়াছে এবং যাহার তোমরা নিন্দা করিয়াছ, তাহার জন্য দোযখ নির্ধারিত হইয়াছে। তোমরা পৃথিবীতে আল্লাহতায়ালার সাক্ষী। অর্থাৎ, "নেকী-বদী—পাপ-পুণ্যের পার্থক্য করিবার শক্তি তোমাদিগকে দেওয়া হইয়াছে "

(বুখারী; 'কিতাবুল জানাইয; 'বাবু সানায়েন নাসে আলাল মাইয়েৎ, ১ : ১৮৩ পৃঃ)

কবরস্থান যাওয়া এবং পরলোকগত বন্ধু-বান্ধব ও আত্মীয়-স্বজনের জন্য দোয়া করা

৩৬৮। হযরত বুরায়দা রাযিয়াল্লাহু-তায়ালা আনহু বলেন যে, আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম মুসলমানগণকে শিখাইয়াছেন যে, তাহাদের কেহ যখন কোন কবরস্থানে যায়, তখন বলিবে, "আস-সালামু আলাইকুম।" অর্থাৎ, "হে এই সব গৃহ (কবর) বাসী মুমেন ও মুসলমান ! তোমাদের প্রতি সালামতি হউক। আমরাও ইনশাআল্‌-লাহু-তায়ালা (আল্লাহ-তায়ালার ইচ্ছায়) তোমাদের সহিত শীঘ্রই সম্মিলিত হইব। আমরা আল্লাহ-তায়ালার নিকট আমাদের জন্য এবং তোমাদের জন্য শান্তি-সাচ্ছন্দ্য ভিক্ষা করিতেছি। ('মুসলিম, কিতাবুল জানাইয, বাবু মা ইউকালু ইন্দা দখুলিল কুবুরে ওয়াদ দোয়ায়ে লে-আহলেহা; ১-২ : ৩৮৭ পৃ)

(ক্রমশঃ)

('হাদীকাতুস সালেহীন' গ্রন্থের ধারাবাহিক অনুবাদ)

—এ, এইচ, এম, আলী আনওয়ার

এতেকাফ ও লাইলাতুল কদর

সহিষ্ণুতা, সম্প্রীতি ও সহানুভূতির মহান কল্যাণময় মাস

হযরত নবী আকরাম (সাঃ আঃ) বলিয়াছেন : "হে জনগণ! তোমাদের নিকট এক মহান মাস (রমজান) আসিয়াছে এবং বরকত ও কল্যাণের দ্বারা চারদিগকে আচ্ছাদিত করিয়াছে। ইহাতে এরূপ একটি রাত্রিও আছে যাহা হাজার মাসের চাইতে উত্তম। আল্লাহ্‌তায়ালা এই মাসের রোজা তোমাদের উপর ফরজ করিয়াছেন, এবং রাত্রিকালের এবাদত নফল হিসাবে নির্ধারণ করিয়াছেন। এই মাসের নফল এবাদতের সওয়াব অন্যান্য দিনের এবাদতের সমতুল্য। এই মাস সবর—ধৈর্য ও সহিষ্ণুতা অর্জন)-এর মাস, এবং সবরের সওয়াব হইল জান্নাত এই মাস পরস্পর সহানুভূতি ও সমবেদনা (প্রদর্শন)-এর মাস। এই মাসে মুমেনের রিজিক (উপজীবিকা) বৃদ্ধি করা হয়। যে ব্যক্তি কোন রোজাদারকে ইফতার করায়, সে গোনাহর ক্ষমা পাইবে ও দোজখের আগুন হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিবে এবং অপরের সওয়াবে কোন প্রকার ঘাটতি সাধন ব্যতিরেকে তাহার রোজার সমপরিমাণ সওয়াব অর্জন করিবে।"

(মেশকাত শরীফ)

o o o

"এই মাসের প্রথম অংশ রহমত (করুণা) সরূপ, ইহার মধ্যভাগ মাগফেরাত (পাপ মোচন) স্বরূপ এবং ইহার শেষাংশ নরকাগ্নি হইতে নিষ্কৃতি (তথা জান্নাত) লাভের কারণ বিশেষ।"

(মেশকাত শরীফ)

o o o

"হযরত আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাহে ওয়া সাল্লাম রমজানের শেষ দশ দিন (মসজিদে) এতেকাফ বসিতেন এবং তাঁহার ওফাত পর্যন্ত সদা নিয়মিত ইহা তিনি পালন করিয়াছেন। অতঃপর তাঁহার স্ত্রীগণও তাঁহার পরে এতেকাফ বসিয়াছেন।"

(বোখারী শরীফ,)

o o o

হযরত আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করেন যে, তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "হে আল্লাহর রসুল! আমি যদি লাইলাতুল কদরের সন্ধান পাই তাহা হইলে আমি তখন কি দোওয়া করিব?" হুজুর (সাঃ) বলিলেন, "তুমি তখন (বিশেষতঃ) এই দোওয়া করিও: "আল্লাহুম্মা ইন্নাকা আফুওউন, তুহিব্বুল আফ্‌ওয়া, ফা'ফু আন্নি"—অর্থাৎ "হে আমার আল্লাহ! তুমি সীমাহীন ক্ষমার অধিকারী, ক্ষমা করা তোমার নিকট অতি প্রিয়; সুতরাং তুমি আমার ক্ষমা কর এবং সকল পাপ আমার মোচন করিয়া দাও।" (তিরমিজি শরীফ)

অনুবাদ : মৌঃ আহমদ সাদেক মাহমুদ, সদর মুরুব্বী

হযরত ইমাম মাহদী (আঃ)-এর

অমৃত বানী

রোযার অপরিহার্যতা ও পবিত্র তাৎপর্য

"নামাযের কথা আমি পূর্বে উল্লেখ করিয়াছি। অতঃপর রোযার এবাদত রহিয়াছে। আক্ষেপ, বর্তমান জামানায় মুসলমান বলিয়া আখ্যাত এরূপ লোকও আছে যাহারা এ সকল এবাদতে পরিবর্ত্তন আনয়ন করিতে চায়। তাহারা অন্ধ—তাহারা খোদাতায়ালার পূর্ণ ও পরিণত প্রজ্ঞা সম্বন্ধে অজ্ঞ। আত্মার শুদ্ধি ও বিকাশের জন্য এ সকল এবাদত অপরিহার্যতার স্বাক্ষর বহণ করে। এই সকল লোক যে জগতে প্রবেশ লাভ করে নাই উহার বিষয়াবলীতে তাহারা বৃথা অনাধিকার চর্চা করে, এবং যে দেশের তাহারা পরিভ্রমণ করে নাই সেখানকার সম্বন্ধে মিথ্যা সংশোধনী প্রস্তাবাবলী পেশ করে। তাহাদের জীবন পার্থিব কাণ্ড-কৌশলেই অতিবাহিত হইয়া থাকে; ধর্মীয় বিষয়াবলী সংক্রান্ত তাহাদের কোনই জ্ঞান নাই। বস্তুতঃ স্বল্প আহার এবং ক্ষুৎ-পিপাসা বরণও আত্মশুদ্ধির জন্য জরুরী। ইহার দ্বারা দিব্য শক্তির (কাশ্‌ফি তাকতের) উন্মেষ ও বিকাশ ঘটে। মানুষ শুধু খাদ্যাহারেই জীবিত থাকে না। অনন্ত ও চিরস্থায়ী জীবনের প্রতি সম্পূর্ণ ধ্যান ছাড়িয়া দেওয়া নিজের উপর আল্লাহ্‌তায়ালার কহর ও অভিশাপকে নামাইয়া আনারই নামান্তর। কিন্তু রোজাদার ব্যক্তির লক্ষ্য রাখা উচিত, রোযার দ্বারা মানুষের পক্ষে শুধু ক্ষুধার্ত থাকাই উদ্দেশ্য নয়, বরং খোদাতায়ালার স্বরণ ও জিকিরের মধ্যে একান্ত মশগুল থাকা উচিত। আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ও সাল্লাম রমযান শরীফে অত্যন্ত এবাদত করিতেন। এই দিনগুলিতে আহার-বিহারের ধ্যান হইতে মুক্ত হওয়া এবং সেই সংক্রান্ত প্রয়োজনাদী হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া আল্লাহর দিকে কাটিয়া পড়া এবং তাঁহাতেই তন্ময়তা ও আবেশ লাভ করা দরকার। হতভাগ্য সেই ব্যক্তি, যাহার দৈহিক খাদ্য তো জুটিল, কিন্তু সে রুহানী খাদ্যের জন্য কোনই পরোয়া করিল না। দৈহিক খাদ্যের দ্বারা যেমন দৈহিক শক্তি লাভ হয়, তেমনি রুহানী খাদ্য আত্মাকে সবল ও কায়েম রাখে, এবং উহার দ্বারা রুহানী শক্তিগুলি সতেজ হয়। খোদাতায়ালার নিকট ফয়েজ ও কল্যাণমণ্ডিত হওয়ার অভিলাষী হও, কেননা সবকিছুর দুয়ার তাঁহারই তওফিক ও সুযোগ-সামর্থ দানে খুলিয়া থাকে। ... ...
ইসলামের রুকণসমূহ নেজাত দানের উদ্দেশ্যেই কায়েম করা হইয়াছে। কিন্তু মানুষ নিজেদের ভুলের জন্য কোথা হইতে কোথায় চলিয়া যায়। মানুষের নিজের আমলের উপর ফখর করা উচিত নয়, এবং তাহার খুশী হওয়াও উচিত নয়, যতক্ষণ পর্যন্ত না এরূপ খালেস ও নিঃখুঁৎ ঈমান হাসিল হয় যাহাতে মানুষের এবাদতে খোদাতায়ালার সহিত কোন প্রকারের শরীক না থাকে এবং তৎসংগে তাহার সকল প্রকার সময়োপযোগী নেক আমল করার সুযোগও যেন হাসিল হয়।"

(১৯০৬ইং সনের সালানা জলসার বক্তৃতা, পৃঃ ২০-২১)

অনুবাদ: মৌঃ আহমদ সাদেক মাহমুদ

ঈদুল ফিতরের খোৎবা

হযরত খলিফাতুল মসীহ সানী আল মুসলেহুল মওউদ (রাযিঃ)

[১৬ই ডিসেম্বর ১৯৩৬ ইং তারিখে প্রদত্ত]

প্রকৃত ঈদ এই যে, মানুষ যেন কর্মে আস্বাদ ও আনন্দ অনুভব করে এবং সে খোদাতায়ালার উদ্দেশ্যে প্রত্যেক প্রকারের কুরবানীর জন্য প্রস্তুত থাকে।

চেষ্টা কর যেন এই প্রকৃত ঈদ তোমাদের হাসিল হয়।

যখন এই ঈদ মানুষের হাসিল হয় তখন আর দুনিয়ার কোন দুঃখ-কষ্ট তাহাকে উদ্বিগ্ন করিতে পারে না।

সুরা ফাতেহা পাঠের পর হুজুর আকদাস (রাঃ) বলেন :

দুনিয়াতে দুই প্রকারের ঈদ আসে। এক স্থায়ী ঈদ, আর এক অস্থায়ী বা সাময়িক ঈদ হইয়া থাকে। অস্থায়ী ঈদের দৃষ্টান্ত হইল ঈদুল ফিৎর এবং ঈদুল-আজহা, এ সকল ঈদ আসে এবং চলিয়া যায়। দীর্ঘদিন পর পুনরায় এক ঈদ আসে এবং কিছুদিন পর আর এক ঈদ আসিয়া যায়। উক্ত দুই ঈদের মধ্যে প্রায় সোয়া দুই মাসের ব্যবধান হইয়া থাকে। এমনি ধারায় প্রত্যেক বৎসর একটির পর আর একটি ঈদ আসে। রসুল করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম জুমাকেও ঈদ বলিয়া আখ্যায়িত করিয়াছেন। এই হিসাবে এক প্রকারের ঈদ প্রত্যেক সপ্তাহে সপ্তম দিনেও আসে। কিন্তু যাহা হউক ছয় দিন অতিবাহিত হওয়ার পর তাহা আসে। সপ্তাহের মধ্যে অন্যান্য দিন জুমা সংক্রান্ত ঈদ হয় না বরং ঈদ শুক্রবারই হয় এবং শুক্রবার অতিক্রান্ত হইলে আবার সাধারণ দিন শুরু হইয়া যায়। মোট কথা, এই তিন প্রকারের ঈদ অস্থায়ী বা সাময়িক ঈদ, স্থায়ী ঈদ নয়। এতদবিষয়ে আল্লাহ্‌তায়ালা মুমেনকে এই সবক দিয়াছেন যে, সে যেন তাহার কোন রুহানী মোকামে পারতুষ্ট হইয়া না পড়ে। যদি কোন ব্যক্তি জুমার দিন আসাতে স্ফীত হয়, যেমন—কোন ছাত্র শুক্রবার আসিলে উহা তাহার ছুটির দিন হওয়াতে স্ফীত হয় এবং স্কুল যাওয়া ছাড়িয়া দেয়, তাহা হইলে পরের দিন তাহাকে শাস্তি দেওয়া হইবে। এক দিকে তাহার বাপ-মা তাহার প্রতি রুষ্ট হইয়া তাহাকে ঘর হইতে স্কুলে পাঠাইবে। আর অন্য দিকে শিক্ষক তাহাকে শাস্তি দিবে। তেমনি ভাবে যদি ঈদের দিন আসিলে মানুষ মনে করে যে, বস্, ঈদ তো আসিয়াই গিয়াছে, সুতরাং রোজাও শেষ হইয়াছে। ইহার পর যখন পুনরায় রমজান মাস আসে তখন যদি সে বলে যে, আমি আর রোজা রাখিতে পারি না কেননা ঈদ যে আসিয়াছিল। তাহা হইলে এইরূপ ব্যক্তি তাহার ঈমান হারাইবে এবং খোদাতায়ালার দৃষ্টি হইতে স্খলিত হইয়া পড়িবে। মোটকথা, এই সকল ঈদ মানুষের দৃষ্টি এই বিষয়ের দিকেই আকৃষ্ট করে

যে, রূহানী মোকামও অস্থায়ী মোকাম হইয়া থাকে। আল্লাহ্‌ তা'য়ালা রহম করুন, একজন আহমদী ছিলেন, এখন তো তিনি ইহজগতে আর নাই। জনৈক বন্ধু শুনাইয়া ছিলেন যে, তিনি তাঁহার নিকট একবার গিয়া বলিয়াছিলেন যে, 'সেলসেলার বিভিন্ন প্রয়োজনের তাগিদে চাঁদা দিন।' তিনি বেশ বিত্তশালী ব্যক্তি ছিলেন। কিন্তু চাঁদার কথা শুনিয়া বলিতে লাগিলেন যে, 'আমি হযরত সাহেবের (আঃ) জমানায় বড় বড় চাঁদা দিয়াছি, এবং এখন আমি মনে করি, আমার উপরে আর কোন চাঁদা বর্তায় না।' অতঃপর ইহার ফল কি দাঁড়াইল? শেষ পরিণাম তাঁহার এই ঘটিয়াছিল যে বন্ধুগণ একদিন দেখিতে পাইলেন যে তিনি নামাজ পড়েন না। তাঁহাকে সে বিষয়ে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিতে লাগিলেন যে, "আমি অনেক নামাজ পড়িয়াছি। সরকারও দীর্ঘকাল পর্যন্ত কাজ লইবার পর পেনশন দেন। খোদা কেন দিবেন না?" অতএব দেখুন, একটি বিষয় (ভুল) তাঁহাকে আর একটি বিষয়ের (ভুলের) দিকে লইয়া গেল। তিনি মিথ্যা আস্থা ও আত্মপ্রতারণার স্বীকার হন এবং মনে করেন যে, তাঁহার ঈদ আসিয়া গিয়াছে, যাহার ফল এই দাঁড়াইল যে, প্রথমে চাঁদা গেল, তারপর নামাজ ছুটিল। অতঃপর আল্লাহ্‌তা'য়ালা তো তাঁহার প্রতি দয়া করিলেন যে, তাঁহাকে মৃত্যু দিলেন, অন্যথায় ইহাও সম্ভব ছিল যে, তিনি বলিতেন যে, 'খোদার উপর আমি বহু দীর্ঘকাল ঈমান রাখিয়াছি, এখন উহা হইতেও পেনশন পাওয়া উচিত।' যদিও তাঁহার জীবনের আমলী অংশ লোপ পাইল কিন্তু মৃত্যুর কারণে তাঁহার ঈমানী অংশ রক্ষিত হইল। ইহা তো একটি অত্যন্ত সুস্পষ্ট ও খোলাখুলি দৃষ্টান্ত। কিন্তু এই প্রকারের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দৃষ্টান্ত প্রায় প্রত্যেক শহরে এবং প্রত্যেক মহল্লায় পাওয়া যায়। কিছু দিন পর্যন্ত কতক মানুষের মধ্যে দ্বীনের খেদমতের জোশ থাকে এবং তাহারা প্রত্যেক প্রকারের কুরবাণীতে অংশ নেন; কিন্তু কিছু দিন পর তাহারা কুরবানী ছাড়িয়া দেন এবং মনে করেন, 'আমরা তো অনেক কিছুই করিয়াছি।' ইহা অস্থিতিশীলতার রুগ্ন স্বভাব, যাহা অনেক মানুষের মধ্যেই দেখিতে পাওয়া যায়। এবং এই অস্থিতিশীলতা মিথ্যা আস্থা ও আত্মপ্রতারণারই নামান্তর। মানুষ মনে করে, সে অনেক কিছু করিয়া ফেলিয়াছে। সে ইহা বুঝে না যে, আমাদের শরিয়তের মধ্যে 'অনেক কিছু'—এর কোন অর্থই নাই। দেখ, আল্লাহ্‌তা'য়ালা কখনও বলেন না যে, আমি আমার বান্দাকে অনেককিছু দিয়া ফেলিয়াছি। কিন্তু বান্দা কিছু দিন খেদমত করার পর মনে করিতে আরম্ভ করে যে, সে অনেক খেদমত করিয়াছে। ইহা কি আশ্চর্যের কথা নয় যে, বান্দাগণ খোদাতা'য়ালা'র দান সম্বন্ধে ইহা বলিতে আরম্ভ করে যে, তিনি অনেক কিছু দিয়াছেন, কিন্তু খোদাতা'য়ালা ইহা বলেন না যে, তিনি তাঁহার বান্দাকে অনেক বেশী দিয়াছেন। সুতরাং দেখুন, আর্যসমাজীগণের বিশ্বাস যে, কিছুকাল পর্যন্ত মানবাত্মাসমূহকে জান্নাতে রাখার পর খোদা-তা'য়ালা সেগুলিকে জান্নাত হইতে বহিষ্কৃত করিবেন এবং সেগুলিকে পুনরায় দুনিয়াতে পাঠাইয়া দিবেন। প্রসিদ্ধ প্রবাদ বাক্য আছে:

دانا دے اور بیوقوفاری کا بیوقت

('দাতা তো দানে উদ্যত কিন্তু কোষাদক্ষের তাহাতে প্রাণ ফাটে)। খোদাতায়ালা তো বলেন, আমি আমার বান্দাদিগকে চিরস্থায়ী জান্নাত দান করিব কিন্তু আর্য সমাজীগণ বলেন যে, চিরস্থায়ী জান্নাত কিরূপে দিতে পারেন? যদি তিনি তাহা দিতে আরম্ভ করেন, তাহা হইলে তাঁহার খাযানা বা ভাণ্ডার 'নাউযু বিল্লা' খালি হইয়া যাইবে। এই আপত্তি প্রকৃতপক্ষে তাহাদের নিজেদেরই (নীচু) স্বভাবের দর্পন স্বরূপ এবং উহাই পরিচায়ক হইয়া থাকে। তাহাদের স্বভাবে যেহেতু কৃপনতা রহিয়াছে এবং তাহারা ইহা বলিতে অভ্যস্ত হইয়া থাকে যে, তাহারা অনেক বেশী দিয়া ফেলিয়াছে, অনেক খেদমত পালন করিয়াছে, সেই জন্য তাহারা খোদাতায়ালার দিকেও সে কথাই আরোপ করে। অথচ, জান্নাতের নেমতসমুহ সম্পর্কে খোদাতায়ালা বলেন: عطاء غير مجذوذ

অর্থাৎ, আমরা জান্নাতীগণকে যাহা কিছু দান করিব তাহা ফেরৎ লইব না বরং আমাদের পুরস্কার দান নিরন্তর অব্যাহত থাকিবে। প্রকৃতপক্ষে সাধারণ মোমেনের জন্য তাহাই প্রকৃত ঈদ। অন্য কথায়, যে স্থায়ী ঈদ সাধারণ মোমেনের জন্য হইয়া থাকে তাহা হইল জান্নাত। এবং জান্নাতই মোমেনের আসল মোকাম।

যে বান্দা এই দুনিয়াতে তাহার রুহানী কর্তব্য সমূহ পরিত্যাগ করিয়া বসিয়া পড়ে, সে ধ্বংস প্রাপ্ত হয়।

আমার একটি ঘটনা সদা স্মরণ পড়ে। আমি একবার জুমার নামাজ হইতে ফারিগ হওয়ার পর মসজিদ হইতে ফিরিতে ছিলাম তখন জনৈক বন্ধু বলিলেন যে, কোন এক ভদ্রলোক আসিয়াছেন যিনি কিছু প্রশ্ন করিতে চান। তিনি একজন গয়র আহমদী ছিলেন। হুশিয়ারপুর এলাকার অধিবাসী ছিলেন। তিনি আগাইয়া আসিলেন এবং বলিলেন যে, আমি একটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে চাই আমি বলিলাম, বলুন। তিনি বলিতে লাগিলেন যে, যদি কেহ নদীর অপর পাড়ে যাওয়ার জন্য নৌকায় আরোহণ করে, সে পাড়ে ভিড়িয়া কি করিবে? উক্ত প্রশ্নের দুইটি উত্তর দেওয়া যাইতে পারিত: সে হয়ত নামিয়া পড়িবে, নয়ত বসিয়া থাকিবে। সাধারণ অবস্থায় মানুষ এই জবাবই দিতে পারে যে, যখন মানুষ নদীর কিনারায় ভিড়ে তখন বুদ্ধিমান মানুষের কাজ এই যে, নৌকা হইতে নামিয়া পড়িবে। সুতরাং সেই ব্যক্তি যেন তাহার ধারণা মত এক বাঁধা আমার সামনে রাখিয়াছিল, এবং মনে করিয়াছিল যে, আমি এই উত্তরই দিব যে, কিনারা আসিয়া গেলে মানুষের নৌকা হইতে নামিয়া পড়া উচিত। এবং আমার সেই উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে সে এই দ্বিতীয় প্রশ্নটি করিত যে, ভাল কথা, যখন মানুষ খোদাকে পাইয়া যায়, তখন তাহার আর এবাদতের কি প্রয়োজন? কিন্তু যেমনি সে ঐ প্রশ্ন করিল তেমনি আল্লাহতায়ালা সেই প্রশ্নের প্রকৃত স্বরূপ ও উদ্দেশ্য আমার নিকট প্রকাশ করিয়া দিলেন এবং আমি তাহাকে এই জবাব দিলাম, যে নদীর মধ্যে সে নৌকায় চড়িয়াছে যদি উহার কোন কিনারা থাকে, তাহা হইলে কিনারা আসিলে সে যেন অবশ্যই নামিয়া যায়, কিন্তু যদি সেই নদীর কোন কিনারাই না থাকে তাহা হইলে সে যেখানেই

নামিবে সেখানেই সে ডুবিয়া যাইবে। আমার এই জবাবে সে হতবাক হইয়া পড়িল এবং কিছুক্ষণ চুপ থাকিবার পর বলিতে লাগিল, 'তাহা হইলে তো এবাদতগুলি সর্বদাই করিতে হইবে।" সে প্রকৃতপক্ষে সাধারণ পীর-ফকীরদের নিকট হইতে এই প্রকারের কথা শুনিয়া আসিয়াছিল এবং তাহার উদ্দেশ্য ছিল, নামাজ পড়া হয় খোদাতায়ালার সাক্ষাৎ লাভের জন্য. কিন্তু যে ব্যক্তি খোদাকে পাইয়া গেল, তাহার আর নামাজের কি প্রয়োজন? রোজা রাখা হয় খোদাতায়ালার মিলনের জন্য। যাহার তাহা লাভ হইয়া গেল, তাহার আর রোজার কি দরকার? তেমনিভাবে জাকাত দেওয়া হয় আল্লাহতায়ালাকে পাওয়ার জন্য, কিন্তু যে আল্লাহকে পাইয়া গেল, তাহার আর জাকাতের কি আবশ্যক? মোট কথা, যত প্রকারের নেকী (পূণ্যকার্য) আছে সবই খোদাতায়ালার মিলন লাভে নিঃশেষ হইয়া গেল। কেননা নেকী সওয়ারী বা বাহণ স্বরূপ হইয়া থাকে, এবং যখন মানুষ গৃহে পৌঁছিয়া গেল, তখন সওয়ারীর উপরে বসিয়া থাকা বোকামিই বটে। আমি তাহার আপত্তি বা প্রশ্নটি অনুধাবন পূর্বক তাহাকে এই জবাব দিলাম যে, যখন গন্তব্যস্থল সীমিত প্রকৃতির হয় তখন মানুষ যানবাহন হইতে নামিয়া পড়িবে কিন্তু যখন গন্তব্যস্থল অসীম ও অনন্ত হয় তখন নামিয়া পড়ার কি অর্থ হইতে পারে? সে যেখানেই নামিবে সেখানেই ধ্বংস হইবে। মোটকথা, আমার অন্তরে আল্লাহতায়ালা এই প্রকৃত সত্য উদভাসিত করিলেন এবং আমি তাহাকে ইহাই বলিলাম যে, অসীম নদীতে নৌকা হইতে অবতরণকারী নিমজ্জিত হইবে, উদ্ধার পাইবে না। তেমনিভাবে, এরূপ অনেক লোক দুনিয়াতে পাওয়া যায় যাহারা যদিও ঐরূপ পীর-ফকীরদের মুরিদ বা শিষ্য হয় না কিন্তু এই প্রকারের ধ্যান-ধারনার বশবর্তী হইয়া থাকে। তাহারা গোপন থাকে, তাহাদের অন্তরের ধারনা জানা থাকে না কিন্তু এমন এক দিন আসে যখন তাহারা উলঙ্গ হইয়া পড়ে এবং তাহাদের অন্তর্নিহিত বিশ্বাস মানুষের নিকট প্রকাশ হইয়া পড়ে। তাহারা যদিও বাহ্যতঃ ঐ সকল পীর-ফকীরে বিশ্বাসী ও তাহাদের অনুসারী হয় না, কিন্তু কার্যতঃ তাহাদের মতাদর্শী ও অনুসারী হইয়া থাকে। তাহারা কিছুদিন নামাজ পড়ে, আর মনে করিয়া লয় যে, অনেক নামাজ তাহারা পড়িয়াছে, এখন তাহাদের আর নামাজের প্রয়োজন নাই। তাহারা কিছুদিন রোজা রাখে, তারপর মনে করে, তাহাদের আর রোজা রাখার প্রয়োজন নাই। তাহারা কিছুদিন দান-খয়রাত করে, তারপর মনে করে, তাহাদের আর দান-খয়রাত করার প্রয়োজন নাই, কেননা অনেক দান-খয়রাত করিয়াছে। অথচ তাহারা তাহাদের খাওয়া-পরার ব্যাপারে কখনও এই ধারনা করে না যে, তাহারা অনেক খাওয়া-দাওয়া করিয়াছে, অনেক কাপড়-চোপড় পরিয়াছে, অনেকদিন তাহারা রুটি বা ভাত খাওয়ার বা পানি পান করার পর ইহা বলে না যে, অনেক রুটি বা ভাত খাইয়াছে এবং পানি পান করিয়াছে; এখন আর না খাওয়ার প্রয়োজন আছে, না পান করার প্রয়োজন আছে, আর না কাপড় পরার প্রয়োজন আছে। বরং তাহারা নিজেদের দৈহিক শক্তি বজায় রাখার জন্য, নিজ দেহকে

শীত ও তাপের ক্রিয়া হইতে রক্ষা করার জন্য সদাসর্বদাই প্রচেষ্টা চালাইয়া যায়। কিন্তু রুহ বা আত্মার যেখানে প্রশ্ন আসে সেখানে বলিতে আরম্ভ করে যে আমরা অনেক এবাদৎ করিয়াছি. এখন আর নামাজ-রোজার প্রয়োজন নাই। অন্য কথায়, দৈহিক খাদ্যের ব্যাপারে তো মানুষ সর্বদা খেয়াল করে যে তাহার অমুক অমুক আহারাদী সদা পাইতে থাকা আবশ্যকীয়। কিন্তু রুহানী খাদ্য সম্পর্কেই তাহার সর্বদা এই ভাব প্রবনতা থাকে যে, উহা যেন সে পরিত্যাগ করিতে পারে। অথচ তাহার নিত্যনৈমত্তিক খাদ্যের যেমন সর্বদা প্রয়োজন আছে তেমনি তাহার রুহানী খাদ্যেরও সদা-সর্বক্ষণ প্রয়োজন রহিয়াছে। কিন্তু তাহার অবস্থা এই দাঁড়ায় যে, কিছুকাল সে নামাজ পড়ে, রোজা এবং শরিয়তের অন্যান্য আদেশ পালন করে কিন্তু যখনই কয়েকটি স্বপ্ন দেখে অথবা কোন কোন আসমানী বরকত ও কল্যাণের কিছু অংশ তাহার হাসিল হয়, তখনই সে মনে করিতে আরম্ভ করে যে, এখন আর তাহার ঐ সকল এবাদতের প্রয়োজন নাই, সে যেন এখন জন্মগতভাবেই স্বাধীন হইয়া পড়িয়াছে—না তাহার নামাজের প্রয়োজন, না রোজা রাখার, না হজ্ব করার, না সেলসেলার নেজামের পাবন্দি করার প্রয়োজন, না এতায়াত ও আনুগত্যের প্রয়োজন ; এখন খোদার সহিত তাহার সরাসরি সংযোগ স্থাপন হইয়াছে ! এইরূপ আহাম্মকের দৃষ্টান্ত ঠিক এমনই, যেমন গভর্নর যখন বাদশাহের সহিত সাক্ষাৎ করিতে যায় তখন কোন কোন সময় বাদশাহ সেই গভর্নরের চাপরাশি বা আর্দালীর সাহতও হাসিয়া দুই এক কথা বলিয়া ফেলে। ইহাতে যদি সেই আর্দালী চাকুরী ছাড়িয়া দেয় এবং মনে করিতে আরম্ভ করে যে, এখন সে এতই বড় হইয়া গিয়াছে যে, বাদশাহ তাহার সহিত সরাসরি কথা বলিতে পারেন। তা হইলে সে নিছক নির্বোধ। সে বুঝে না যে, যখন গভর্নর চলিয়া যাইবে এবং সে সেখানে থাকিবে, তখন তাহাকে কান ধরিয়া বাহির করিয়া দেওয়া হইবে। এবং যেদিন সে গভর্নরের অধীন চাকুরী হইতে পৃথক হইবে, সেই দিন হইতে কেহই তাহাকে নিজের দুয়ারেও ভিড়িতে দিবে না।

প্রকৃতপক্ষে, কোন সময়ে আর্দালির সহিত বাদশাহর কথা বলার অর্থ আর্দালির সহিত কথা বলা নয়, বরং গভর্নরের সহিত কথা বলা হইয়া থাকে, এবং তাহার এরূপই দৃষ্টান্ত হইয়া থাকে, যেমন আমাদের নিকট কোন বন্ধু দেখা করিতে আসে এবং তাহার সহিত কোন ছোট শিশু থাকে, তখন সেই শিশুটিকেও আমরা একটু আদর করিয়া দেই। এমতাবস্থায় সেই শিশুর প্রতি স্নেহ প্রদর্শনের অর্থ প্রকৃতপক্ষে সেই বন্ধুর প্রতিই আমাদের ভালবাসা প্রকাশ করা হইয়া থাকে। অন্যথায় সেই শিশুটির প্রতি আমাদের কি বা ভালবাসা থাকিতে পারে? সে তো যখন বড় হইবে, তখন জানা যাইবে, সে আমাদের প্রতি বন্ধুত্ব রাখিবে না শত্রুতা! এখন যে আমরা তাহাকে স্নেহ করি তাহা তো প্রকৃতপক্ষে বন্ধুর কারণে। যেহেতু আমাদের বন্ধুর কার্যাবলী প্রকাশমান এবং আমরা জানি যে সে আমাদের প্রতি ভালবাসা রাখে, সেজন্য তাহার সন্তানের প্রতিও স্নেহ প্রদর্শন করি।

সুতরাং অনেকে এই বোকামীর কারণে যে, তাহাদের উপরও আল্লাহ্‌তায়ালার তরফ হইতে কোন কোন ফরেজ বা কল্যাণ নাজেল হইয়াছে বলিয়া তাহারা মনে করিতে আরম্ভ করে যে, এখন তাহারা সেই মোকামে পৌঁছিয়া গিয়াছে যেখানে তাহাদের আর কোন সাধনা বা খেদমত পালন করার প্রয়োজন নাই। ইহার ফল দাঁড়ায় যে, তাহারা মারা পড়ে এবং ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। তাহারা একটি অস্থায়ী ঈদকে স্থায়ী ঈদ বলিয়া ধরিয়া নেয় এবং এমনি ধারায় রুহানীরূপে তাহারা নিপাত হইয়া যায়। অথচ চিরস্থায়ী ঈদ মৃত্যুবরণের পরপারের ঈদই হইয়া থাকে। অথবা সেই ব্যক্তির জন্য স্থায়ী ঈদ হয়, যে তাহার জীবদ্দশাতেই মৃত্যুকে বরণ করিয়াছে। কিন্তু আমল ঐরূপ ব্যক্তির ক্ষেত্রেও মাফ বা রহিত হয় না।

দ্বিতীয় প্রকার বোকামী এই হইয়া থাকে যে, মানুষ আমলকে শাস্তি স্বরূপ মনে করে অথচ আমল যদি শাস্তি হয় তাহা হইলে খাদ্যও শাস্তি। কেননা রুটি বা ভাত খাওয়াও একটি আমল বা কর্ম। পানি পান করাও একটি কর্ম এবং কাপড় পরাও একটি আমল কিন্তু দৈহিক ক্ষেত্রে তো মানুষের স্বভাব এই যে, তাহারা যত বেশী শক্তি লাভ করে, তত বেশী খাওয়া-পরার আমল বা কর্মকে বাড়াইয়া দেয়, কম করে না। সুতরাং দেখুন, কোন শক্তিশালী ব্যক্তি তাহার আহার কমায় না বরং পূর্বের তুলনায় বাড়াইয়া দেয়। অথবা যখন মানুষ বিত্তশালী হইয়া উঠে, তখন সে তাহার পোষাকের সংখ্যা কমায় না বরং বাড়ায় কিন্তু রূহানীয়তের ক্ষেত্রে মানুষ চায় যেন তাহাদের খাদ্য কমাইয়া দিতে পারে। অথচ রূহানিয়তের অধিকারী ব্যক্তিবর্গও যেমন উত্তরোত্তর রুহানী শক্তি তাহাদের হাসিল হইতে থাকে তেমনই তাহাদের রূহানী খাদ্য বৃদ্ধি করিতে থাকে, কমানোর কথা দূরে থাক।

একজন পাহ্‌লোয়ানের খাদ্য এবং একটি শিশুর খাদ্যের মধ্যে তফাৎ কি? ইহাই যে শিশু কম খায় এবং পাহ্‌লোয়ান বেশী খায়। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় যে, মানুষ মনে করে, তাহারা রুহানী পাহ্‌লোয়ান হওয়ার দাবী তো করিয়া বসুক কিন্তু তাহাদের খাদ্য শিশুদের তুল্য থাকুক। তোমরা কি কখনও দেখিয়াছ যে, কোন পাহ্‌লোয়ান ব্যক্তি চুষি-কাঠির দ্বারা দুধ পান করিতে শুরু করিয়াছে? এবং সে ইহা বলে যে, এখন যেহেতু আমি পাহ্‌লোয়ান হইয়া গিয়াছি, সেজন্য চুষি-কাঠির দ্বারা পান করি? এরূপ যখন কখনও হইয়া থাকে না, বরং পার্থিব দেহ সম্পর্কে ইহা বলা হয় যে, পাহ্‌লোয়ান এবং শিশুর মধ্যে তুলনাই বা কি হইতে পারে?! সুতরাং রুহানী ব্যাপারে কমতির দিকে আসাও কোন রুহানী ব্যক্তির কাজ হইতে পারে না। আপনারা কখনও হয়ত এরূপ ঘটিতে দেখেন নাই, কোন শক্তিশালী বিরাট পাহ্‌লোয়ান ইহা বলে যে, দুধের এক ছোট্ট পেয়ালা তার তৃপ্তি মিটাইবার জন্য যথেষ্ট; এক সের পরিমাণ দুধ এবং অন্যান্য পুষ্টিকর শক্তিশালী খাদ্যের তাহার প্রয়োজন নাই। কিন্তু রুহানীয়তের ব্যাপারে যখনই মানুষের উপর সামান্য কিছু এলাহী ফরেজ নাযেল হয়, তখন সে দুর্বলতা দেখাইতে আরম্ভ করে এবং বলে, এখন তাহার এই সকল মুজাহেদা ও সাধনার প্রয়োজন কি?! এইরূপ ধারণা পাগলামীর লক্ষণ তো হইতে পারে কিন্তু জ্ঞান-বুদ্ধির আলামত বলিয়া আখ্যাত হইতে পারে না।

মোট কথা, আমল কোন অবস্থাতেই পরিত্যাগ করা যায় না—ইহকালেও না, পরকালেও না। পার্থক্য শুধু এইটুকু যে, পরকালে মুমেনের জন্য যে চিরস্থায়ী ঈদ হইবে উহার এই অর্থ হইবে যে, তখন সেই পুরস্কার আর বিনষ্ট হইবে না। অন্যথায়, কাজ সেখানেও পরিত্যক্ত হইবে না। পরিশেষে আল্লাহতায়ালা ঈদের দিনে কোন নামাজ মাফ তো করিয়া দেন নাই, বরং একটি নামায তিনি আরও বাড়াইয়া দিয়াছেন, যাহার অর্থ এই দাঁড়ায় যে, ইসলামী ও রুহানী ঈদ কাজ ছাড়িয়া দিবার নাম নয় বরং কাজ বাড়াইয়া দেওয়ার নামই ঈদ।

মোট কথা, আমল কোন অবস্থাতেই ছাড়া যায় না—এই জাহানেও নয় এবং ঐ জাহানেও নয়। অবশ্য পুরস্কার স্থায়ী হইতে পারে। এবং উহা কখনও এই দুনিয়াতেও মানুষ স্থায়ীরূপে লাভ করে। যাহারা এই দুনিয়াতে জীবিত থাকা অবস্থাতেই মরিয়া যায়, তাহাদের পুরস্কারকে আল্লাহতায়ালার তরফ হইতে স্থায়ী (রূপদান) করা হয়—অন্য কথায়, এরূপ লোকের উপর ইহকালেই 'ইওমুল—বা'স' (পুনরুত্থান দিবস)-এর আগমন ঘটে, যে সম্বন্ধে কুরআন করীমে আসিয়াছে যে, শয়তান আল্লাহতায়ালার নিকট আবেদন করিয়াছিল, তাহাকে যেন কিছু অবকাশ দান করা হয় যাহাতে সে মানুষকে 'ইওমিল-বা'স' পর্যন্ত প্ররোচিত ও পথভ্রষ্ট করিতে পারে। ইহার দ্বারা জানা যায় যে, যে-ব্যক্তির উপর 'ইওমুল-বা'স' আসিয়া যায় তাহার ঈদ এই দুনিয়া হইতেই স্থায়ী হইয়া যায় এবং সে তাহার মোকাম ও দর্জা হইতে স্খলিত বা পতিত হয় না। রসুল করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের উপর সেই ঈদ এ দুনিয়াতেই আসিয়াছিল এবং তিনি এরূপ মোকামে পৌঁছিয়া ছিলেন যে তাঁহার জন্য অসম্ভব ছিল যে তিনি পতিত হইতে পারিতেন। কিন্তু প্রশ্ন এই যে, তিনি কি আমল করা ছাড়িয়া দিয়াছিলেন? তিনি কি নামায সমূহ ছাড়িয়া দিয়াছিলেন? তেমনিভাবে শরীয়তের অন্যান্য আহকাম অনুযায়ী আমল করা পরিত্যাগ করিয়াছিলেন? তেমনিভাবে হযরত মসীহ মওউদ (আঃ)-এর উপরও সেই দিবস আসিয়াছিল কিন্তু তিনি কি দ্বীনের প্রচার ও প্রসারের কাজ ছাড়িয়া দিয়াছিলেন? খেদমতে-খালক (সৃষ্টির সেবা) কি ছাড়িয়াছিলেন? আমরা তো ইহাই দেখি যে, তিনি রাত-দিন সমানে কাজ করিতেন। সুতরাং কাজ ছাড়িয়া বসার নাম ঈদ নয়, বরং কাজকে বাড়াইয়া দেওয়া এবং উহাতে আনন্দ অনুভব করাই ঈদ।

সুতরাং দেখুন, যেদিন আমরা ঈদ পালন করি সেদিন পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ ব্যতীত এক ষষ্ঠ বার নামাজও আমাদের পড়িতে হয়। কিন্তু যেহেতু আমরা জানি যে, উহার দ্বারা রুহানীয়তের উন্নতি হয়, আল্লাহতায়ালার সন্তোষ লাভ হয় এবং তাঁহার মহব্বত হাসিল হয়—ইহা শুধু আমাদের আকীদা বা বিশ্বাসের কথাই নয় বরং আমাদের জামাতের মধ্যে প্রতিটি অংশ অভিজ্ঞতার মাধ্যমেএই সকল নে'মত প্রত্যক্ষ করিয়াছে, সেইজন্য এই অতিরিক্ত এবাদত বোঝা হওয়ার পরিবর্তে আমাদের জন্য আনন্দের কারণ হইয়া থাকে। কিন্তু যে ব্যক্তি এই সত্য সম্বন্ধে অজ্ঞ এবং ঈদের অর্থ শুধু এটুকুই মনে করে যে, ভাল কাপড় পড়িয়াছে এবং ভাল ভাল

খাইয়াছে, সে ইহাই বলিবে যে, ভাল বিপদই আসিল—পূর্বে তো পাঁচ ওক্তেরই নামায ছিল, আজ যে ঈদের দিন, তাহাতে ছয় উক্ত নামায আরোপ করা হইয়াছে, আবার এই নামাযের সঙ্গে খোৎবাও রাখা হইয়াছে, অন্য কথায়, ষষ্ঠ নামাজের পরেও যেটুকু সময় মানুষ তাহার ঘরে কাটাইতে পারিত, সেইটুকু সময়ও আর থাকিতে দেওয়া হয় নাই, উহারও একাংশ খোৎবার জন্য রাখা হইয়াছে। কিন্তু ইহা নির্বুদ্ধিতার কথা এবং এ সকল ধারণার তখনই উদয় হয় যখন কর্মের মাহাত্ম্য ও মূলতত্ত্ব মানবের নিকট সুপ্রকাশিত হয় না। অন্যথায় যে সকল লোকের উপর يوم يبعثون (ইওমা ইউবয়াসুন) সংক্রান্ত অবস্থা বিরাজিত হয়, তাহারা কর্মকে বোঝা মনে করে না, বরং তাহাতে আরও আনন্দিত হয়। যেমন, পিতা যখন তাহার সন্তানগণের জন্য কোন কাজ করে তখন উহাকে বোঝা মনে না করিয়া বরং আনন্দ অনুভব করে, অথবা একজন খোদাভীরু ডাক্তার যে খেদমতে-খালকে মশগুল থাকে এবং রাত হউক বা দিন হউক রুগীদিগকে দেখার জন্য চলিয়া যায়, সে খেদমত বা সেবাকে বোঝা মনে করে না বরং আনন্দ অনুভব করে অথবা জ্ঞান শিক্ষাদানকারী সাধক ব্যক্তি যে চায় যেন সব সময় ছাত্রদিগকে জ্ঞান শিক্ষা দিতে পারে এবং রাত দিন এই কাজে আত্মনিবেদিত থাকে সে এই কাজকে বোঝা মনে করে না বরং সে খুশী হয় যে খেদমত করার তওফিক পাইতেছে। সুতরাং যখন মানবের অন্তরে স্বতঃস্ফূর্ত আনন্দ ও আত্ম প্রসাদের সৃষ্টি হয় তখনই আমল বা কর্ম আনন্দের কারণ হয়। যদি তাহা না হইয়া থাকে তাহা হইলে আমল কষ্টকর বোধ হয়। হযরত নবী করীম (সাঃ আঃ) অন্তরের স্বতঃস্ফূর্ত আনন্দ ও আত্ম-প্রসাদের অপর নাম ঈমান রাখিয়াছেন। সুতরাং যে পূর্ণ ঈমান লাভ করে তাহার সেই পূর্ণ আত্ম-প্রসাদও হাসিল হইয়া যায়। যেমন, কুরআন শরীফে আল্লাহতায়ালা বলেন,

والنازعات غرقا والناشطات نشطا

অর্থাৎ, কতক লোক এরূপ হয় যাহারা কাজ করিতে করিতে উহাতে সম্পূর্ণ তন্ময় ও বিলিন হইয়া যায় এবং তাহাদের অন্তরের সকল গিরো খুলিয়া যায়। অতঃপর তাহারা ঐ কাজে স্বতঃস্ফূর্ত আনন্দ অনুভব করিতে আরম্ভ করে তারপর ফরমাইয়াছেন যে, এই সকল ব্যক্তিই পূর্ণ মুমেন। সুতরাং প্রকৃত ঈদ তখনই হয়, যখন মানুষ কর্মে আনন্দ অনুভব করিতে আরম্ভ করে এবং কাজকে বোঝা মনে না করে। বরং যত বেশী খোদাতায়ালার উদ্দেশ্যে তাহাকে কুরবানী পেশ করিতে হয়, অথবা মানুষের জন্য ত্যাগ শিকার করিতে হয়, অথবা নেযামে-সেলসেলার উদ্দেশ্যে তাহাকে কুরবানী দিতে হয়, এই সকল কুরবানী তত বেশী তাদের অন্তরে আনন্দ ও তৃপ্তির সঞ্চার করে, এ সকল বিষয়ের সুযোগ ঘটার জন্য কাজকে সে কষ্টকর বোধ না করিয়া বরং কর্মেই তাহার সাদ লাগে। এই মোকাম ও দর্জা কখনও অস্থায়ী হইয়া থাকে, আর কখনও স্থায়ী। যখন অস্থায়ী হয় তখন তাহার দৃষ্টান্ত সেই ঈদের ন্যায় হয় যাহা আসে এবং চলিয়া যায়। আর কাহারও জন্য একটি ঈদ আসে, কাহারও জন্য সপ্তাহে প্রতিটি ষষ্ঠ দিন ঈদ হয়, আর কেহ কেহ এমনও আছে, যাহার জন্য প্রতিদিনই ঈদের দিন হইয়া থাকে, কেননা তাহার ঈদ চব্বিশ ঘণ্টার দিনে আসে না, বরং তাহার জন্য আল্লাহতায়ালা সেই দিনকে ঈদের জন্য নির্ধারণ করেন,

যে দিন সম্বন্ধে তিনি বলিয়াছেন : فى يوم كان مقداره الف سنة مما تعدون

অর্থাৎ, খোদাতায়ালার কতেক কাজ এরূপ দিনেও হইয়া থাকে যাহা তোমাদের (মানুষের) গননা অনুযায়ী এক হাজার বৎসরকালের সমান হইয়া থাকে। এমনি ধারায় কোন বুজুর্গ ছিলেন যিনি রাত দিন দ্বীনের খেদমতে মশগুল থাকিতেন এবং নিজের রুজী উপার্জনের বিষয়ে কোন চিন্তা করিতেন না। অন্যএক বুজুর্গ যিনি তাঁহার মর্তবাকে জানিতেন না একদিন তাঁহাকে উপদেশ করিলেন যে, আপনার কিছু কাজও করা উচিত এবং পরিশ্রম করিয়া রুজী উপার্জন করা উচিত। তিনি বলিলেন, "দেখুন, সাহেব! আমি আল্লাহতায়ালার মেহমান। যদি মেহমান নিজে খানা পাক করিতে আরম্ভ করে তাহা হইলে ইহাতে মেজবানের কিরূপ অবমাননা হইয়া থাকে? সুতরাং আমি যদি আমার রুজির সম্বন্ধ চিন্তা করি, তাহা হইলে আমার খোদা আমার প্রতি অসন্তুষ্ট হইয়া পড়িবেন।" সেই বুজুর্গও আলেম ছিলেন। ইহা শুনিয়া তিনি বলিলেন, "আপনি তো কথা যুক্তিসঙ্গতই বলিয়াছেন, কিন্তু রসুল করীম (সাঃ) ফরমাইয়াছেন, মেহমানী তিন দিন হইয়া থাকে। আপনার মেহমানী তো এখন দীর্ঘ হইয়া গেল। সুতরাং ইহা মেহমানী আর থাকিল না বরং ইহা তো সাওয়াল বা ভিক্ষায় পরিণত হইয়াছে। প্রত্যুত্তরে তিনি বলিলেন, "ইহা সওয়াল বা ভিক্ষা তাহাদের জন্য হইবে, যাহাদের দিন চব্বিশ ঘন্টার দিন হয়। আমি সেই দিনে বিশ্বাসী, যে দিন সম্বন্ধে তিনি বলিয়াছেন : فى يوم كان مقداره الف سنة مما تعدون সুতরাং যেদিন মেহমানীর তিন হাজার বৎসর পূর্ণ হইবে সেই দিন আমি আমার (রুজী উপার্জনের) কাজ আরম্ভ করিব" ইহার অর্থ এই ছিল যে, তিনি চিরকাল মেহমান স্বরূপই ছিলেন

উল্লিখিত মোকামে উপনীত ব্যক্তি যাহাকে খোদাতায়ালা বলিয়াছেন যে, এখন তোমার ঈদ আমি চিরস্থায়ী করিয়া দিয়াছি সে প্রত্যেক প্রকারের অধঃপতন হইতে সংরক্ষিত হইয়া যায়, কিন্তু কাজ তিনিও ছাড়িয়া দেন না। কেননা এই মোকাম সেই ব্যক্তিকেই দান করা হয়, কর্মেই যে সাদ পাইতে আরম্ভ করে।

যদি কোন ডাক্তার কোন রুগীকে পাঁচ মাস মার্ফিয়ার ইঞ্জেকশন দিতে থাকে, তারপর তাহাকে বলে যে, এখন ইহা ছাড়িয়া দাও, মার্ফিয়ার ইঞ্জেকশনের আর প্রয়োজন নাই। তাহা হইলে সেই রুগী মার্ফিয়ার ইঞ্জেকশন ছাড়িয়া দিতে পারে না, কেননা উহাতে সে অভ্যস্ত হইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু মার্ফিয়া বা আফিমের যে অভ্যাস উহার চাইতে অনেক বেশী নেক কাজের হইয়া থাকে। এবং যখন কোন ব্যক্তি নেক কাজে অভ্যস্ত হয়, তখন তাহাকে যত ইচ্ছা মার-পিট করিলেও সে উহা ছাড়িতে পারে না। আপনারা কি দেখেন না যে আল্লাহতায়ালার নবীগনের উপর যাহারা ঈমান আনে বিরুদ্ধবাদীরা অতঃপর তাহাদিগকে কত মার-পিট করে কত জ্বালাতন করে গাল-মন্দ দেয় বয়কট করে এবং বলে তাহার (নবীর) মজলিসে যাইবে না, কিন্তু যেমনি তাহারা (তাহাদের কবল হইতে) মুক্ত হয় সবকিছু ছাড়িয়া দিয়া তাহাদের নবীর নিকট ছুটিয়া যায়। এমন এমন দুঃখ-কষ্ট নবীগণের বিশ্বাসীদিগকে

দেওয়া হইয়াছে, যে-গুলির কোন দৃষ্টান্ত পাওয়া যাইবে না। কিন্তু এই সকল বৃত্তান্ত হইতেই জানা যায় যে যখনই তাহাদের হাত-পা মুক্ত করা হইয়াছে তখনই তাহারা ছুটিয়া আবার তাহাদের নবীর দরবারে পৌঁছিয়া গিয়াছেন। হযরত আবু জর গাফ্ফারী (রাঃ)-এর দৃষ্টান্তই যেমন হাদিস-গ্রন্থাবলীতে পাওয়া যায়। যখন তিনি প্রথম প্রথম রসুল করীম (সাঃ)-এর উপর ঈমান আনেন তখন পর্যন্ত খুব কম সংখ্যক লোক (তাঁহার উপর) ঈমান আনিয়াছিল। প্রায় ষোল সতের জন মাত্র লোক ছিলেন যাহারা ইসলামে দাখিল হইয়াছিলেন। তিনি আবু জর) কোন মুসলমানের নিকট রসুল করীম (সাঃ সম্বন্ধে শুনিয়া তাঁহার উপর ঈমান আনিয়া ফেলিলেন। কিন্তু নিবেদন করিলেন, "হে রসুলুল্লাহ! আমার গোত্রের লোক যেহেতু এখনও ঈমান আনে নাই, সেইজন্য আপনি আমাকে অনুমতি দিন যাহাতে আমি আমার ঈমানকে ততক্ষণ পর্যন্ত গোপন রাখি, যতক্ষণ পর্যন্ত না তাহারাও ঈমান আনে।" রসুল করীম (সাঃ) তাঁহাকে অনুমতি দান করিলেন। কিন্তু যখন তিনি রসুল করীম (সাঃ)-এর দরবার হইতে উঠিয়া বাহিরে আসিলেন, তখন দেখিতে পাইলেন যে, এক জায়গায় কাফেরদিগের মজলিস জমিয়াছে এবং মক্কার বড় বড় সরদারগণ রসুল করীম সাঃ)-কে গাল-মন্দ দিতেছে। তখন তিনি আর তাহা বরদাস্ত করিতে পারিলেন না এবং সজোরে বলিয়া উঠিলেন, "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রসুলুল্লাহ।" এরূপ ভয়ঙ্কর শত্রুদের নিকট যাহারা নিজেদের শক্তি ও ঐশ্বর্যের উপরও অত্যন্ত গর্বান্বিত ছিল, যখন তিনি উচ্চৈস্বরে কলেমা পাঠ করিলেন, তখন কাফেরদের জোশ আসিয়া গেল এবং তাহারা তাঁকাকে এতই মার-পিট করিল যে তিনি আহত হইয়া ধরাশায়ী হইয়া পড়িলেন। ঘটনাক্রমে হযরত আব্বাস তখন সেই দিক দিয়া যাইতেছিলেন। তিনি কাফেরদিগকে বলিলেন "গাফ্ফার গোত্র হইতে তোমাদের নিকট শষ্য আসিয়া থাকে। যদি তোমরা তাহাকে ছাড়িয়া না দাও এবং তাহার কোম তাহার পক্ষ সমর্থন করে, তাহা হইলে তোমাদের নিকট শষ্য আস বন্ধ হইয়া যাইবে এবং তোমরা না খাইয়া মরিবে। সেজন্য তাহাকে ছাড়িয়া দেওয়াই শ্রেয়" পরিশেষে বড়ই কৌশল তিনি হযরত আবু জরকে তাহাদের কবল হইতে মুক্ত করিলেন। তিনি (আবুজর) ঘরে যাইয়া কয়েকদিন যাবৎ ঔষধ-পত্র করিলেন যখন আরোগ্য লাভ করিলেন, তখন বাহির হইয়া আবার দেখিলেন যে কাফেরদের আসর জমিয়াছে এবং তাহারা রসুল করীম (সাঃ)-কে গাল-মন্দ বলিতেছে পুনঃরায় তাঁহার জোশ আসিল এবং তিনি সজোরে বলিয়া উঠিলেন, "আশহাদু আন লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ও আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রসুলুল্লাহ" তাহারা পুনরায় তাঁহাকে বেদম মার-পিট করিল এবং তাঁহাকে ভিষণভাবে ক্ষতবিক্ষত করিল। তিনি আবার গৃহে আসিয়া কয়েক দিন যাবৎ চিকিৎসা করার পর যখন বাহির হইলেন তখন অনুরূপ একটি মজলিসে তিনি উচ্চৈস্বরে তাঁহার ইসলাম ঘোষণা করিলেন। এবং মানুষে তাঁহাকে পুনরায় মার-ধর করিল। এখন লক্ষ্য করুন, উহা এক আস্বাদ ছিল যাহা তিনি উপভোগ করিতেছিলেন এবং উহার ফলশ্রুতিতেই তিনি বার বার তাঁহার মুসলমান হওয়ার ঘোষণা করিয়া যাইতেছিলেন আর বারংবার মার খাইতেছিলেয় এবং যদিও রসুল করীম (সাঃ)-এর পক্ষ হইতে তিনি অনুমতি পাইয়াছিলেন যে, তিনি তাঁহার মুসলমান হওয়ার বিষয় গোপন রাখিবেন, কিন্তু কর্মে আস্বাদ লাভের কারণে তিনি তাহা প্রকাশ্যে ঘোষণা করিতে বাধ্য হইয়া পড়িয়াছিলেন এবং প্রহার ভোগ করিয়াছিলেন।

তেমনিভাবে রসুল করীম (সাঃ)-এর জামানায় এক বালক ছিল। বার-তের বৎসর মাত্র তাহার বয়স। সে মুসলমান হইয়া গেল। তাহার মা-বাপের একমাত্র সন্তান ছিল সে। কিন্তু যেহেতু সে মুসলমান হইয়া গিয়াছিল এবং তাহার মাতা-পিতা ইসলামের ঘোর শত্রু ছিল সেজন্য যখন খাওয়ার সময় হইত তখন তাহার মা কুকুরের সামনে যেভাবে রুটি নিক্ষেপ করা হয় সেইভাবে তাহার সম্মুখে রুটি নিক্ষেপ করিয়া খাইতে দিত। পাত্রে রাখিয়া এজন্য খাবার দিত না যে, উহাতে পাত্র অপবিত্র হইয়া যাইবে। পরিশেষে যখন সে ইসলামে মজবুতীর সহিত কায়েম থাকিল, তখন মা-বাপ তাহাকে গৃহ হইতে বাহির করিয়া দিল এবং বলিল, হয়ত তুই মুহাম্মদ (সাঃ)-এর নিকট যাওয়া ছাড়িয়া দে, নয়ত ঘর হইতে বাহির হইয়া যা। সে গৃহ পরিত্যাগ করিল এবং যথাসম্ভব হাবশার (এবেসেনিয়ার) দিকে হিজরত করিয়া চলিয়া গেল। বহু বৎসর পর সে ফিরিয়া আসিল। তাহার মা যখন জানিতে পারিল, সে তাহাকে খবর পাঠাইল, 'আমি তোমার সহিত দেখা করিতে চাই, আমার সহিত আসিয়া দেখা করিয়া যাও।' স্বল্প বয়সের বাচ্চা ছিল যখন সে তাহার মাতা-পিতার নিকট হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়াছিল। তদুপরি সে তাহার মা-বাপের একমাত্র সন্তান ছিল। সে বহু বৎসর যাবৎ গৃহ হইতে বাহিরে থাকার কারণে ধারণা করিয়াছিল যে, হয়ত তাহার মায়ের মন এখন নরম হইয়াছে, কিন্তু যখন সে তাহার সহিত দেখা করিতে গেল, তখন সে তাহাকে সাদরে বুকে জড়াইয়া ধরিয়া বলিল, "হে পুত্র! এখন তো আশা করি, তুমি ঐ সাবীর নিকট আর যাইবে না।" সেই যুবক সাহাবী তৎক্ষণাৎ তাহার নিকট হইতে সরিয়া পড়িল এবং বলিল "হে মা! আমি তো মনে করিয়াছিলাম যে, আমার বহুদিন দূরে থাকার কারণে তোমার মন হইতে বিদ্বেষ তিরোহিত হইয়াছে কিন্তু তোমার অবস্থা তো পূর্ববৎই রহিয়াছে। আমি তোমার জন্য মোহাম্মদর রসুলুল্লাহ (সাঃ) কে ছাড়িয়া দিতে পারি না। এই বলিয়া সেই যুবক তৎক্ষণাৎ গৃহ ত্যাগ করিল। তারপর সে কখনও তাহার মায়ের মুখ দেখে নাই।

সুতরাং প্রকৃত ও সত্যকার ঈদ উহাই, যেদিন মানুষ কর্মে আস্বাদ অনুভব করিতে আরম্ভ করে এবং সে খোদাতায়ালার উদ্দেশ্যে প্রত্যেক প্রকারের কুরবানীর আগুনে ঝাপাইয়া পড়িতে প্রস্তুত থাকে এবং কর্মচ্যুতি বা কর্মত্যাগের নিকটও ভিড়ে না। এই মোকাম যখন কোন ব্যক্তি বা জাতির হাসিল হয় তখনই সে বা তাহারা প্রকৃত ঈদের অধিকারী হয় এবং দ্বীনী ও দুনিয়াবী উদ্দেশ্যবলীতে সফলকাম হইয়া যায়। সুতরাং চেষ্টা কর যেন তোমরা এই ঈদের অধিকারী হইতে পার। এবং তোমাদের সর্বৈব আস্বাদ এবং সর্বিক আনন্দ ইহাতেই অনুভব হয় যে তোমরা খোদাতায়ালার জন্য নিজেদের সর্বস্ব ও সব কিছুই কুরবান করিয়া দাও এবং ইহাকেই ঈদ মনে কর। আল্লাহতায়ালা তোমাদের সঙ্গে হউন এবং তামাদিগকে সেই ঈদের অংশীদার করুন, যাহা লাভ হইলে পর দুনিয়ার কোন দুঃখ-কষ্ট মানুষকে আর উদবিগ্ন করিতে পারে না।

(আল-ফজল, ২৩শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৬৮ ইং হইতে অনুদিত)

অনুবাদ : মৌঃ আহমদ সাদেক মাহমুদ, সদর মুরুব্বী।

হযরত ইমাম মাহদী (আঃ)-এর সত্যতা

মূল : হযরত মীর্যা বশীরউদ্দীন মাহমুদ আহমদ, খলিফাতুল মসীহ সানী (রাঃ)

(পূর্ব প্রকাশিতের পর—৪৭)

সুরা 'তকভীর' প্রসঙ্গে ঃ

এখন আমরা দৃষ্টান্ত হিসেবে সুরা তাকভীরের কথা উল্লেখ করবো। এই সুরাটি সম্বন্ধে অন্যান্য তফসীরকারীগণ বলেছেন যে, এই সুরায় বর্ণিত বিষয়বস্তু দ্বারা কেয়ামত বা শেষ বিচার দিবস সংক্রান্ত কতকগুলো ভবিষ্যদ্বাণীকে বুঝানো হয়েছে। কিন্তু একটু গভীর ভাবে বিবেচনা করলে দেখা যাবে যে, এই সুরায় প্রকৃতপক্ষে বর্তমান কালের অবস্থা সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে। সুরা তকভীরের দুই থেকে ১৩ নম্বর আয়াতের অনুবাদ নীচে দেওয়া হলো :

"যখন সূর্য আচ্ছাদিত হইবে ; এবং যখন তারকারাজি নিষ্প্রভ হইবে ; এবং যখন পর্বত সমূহ স্থানান্তরিত হইবে এবং যখন দশ মাসের উষ্ট্রি পরিত্যক্ত হইবে ; এবং যখন জন্তু জানোয়ার গুলিকে একত্রিত করা হইবে ; এবং যখন সমুদ্রগুলি পরস্পরের মধ্যে প্রবাহিত হইবে; এবং যখন মানুষকে একত্রিত করা হইবে; এবং যখন শিশু কন্যাকে জীবন্ত অবস্থায় কবরস্থ করা সম্পর্কে প্রশ্ন উত্থাপিত হইবে—কি অপরাধে তাহাকে হত্যা করা হইল? এবং যখন বই-পুস্তক চতুর্দিকে ছড়াইয়া পড়িবে; এবং যখন আকাশ উন্মুক্ত হইবে; এবং যখন অগ্নি প্রজ্বলিত করা হইবে, এবং যখন জান্নাতকে সন্নিকটবর্তী করা হইবে।" (সুরা তকভীর ১-১৩ আয়াত)।

অন্যান্য তফসীরকারগণ উল্লিখিত সুরার দুটি আয়াত অর্থাৎ "যখন সূর্য আচ্ছাদিত হইবে এবং যখন তারকারাজি নিষ্প্রভ হইবে"—এই দুটি আয়াত দ্বারা বিভ্রান্ত হয়েছেন। তাঁরা এই দুটি আয়াতের সাধারণ ব্যাখ্যা হিসেবে উল্লেখ করেছেন যে, এই সব ঘটনা দ্বারা কেয়ামত দিবসের লক্ষণ বুঝানো হয়েছে। এই দুটি আয়াতের এরূপ ব্যাখ্যার প্রেক্ষিতে তারা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে, উক্ত সুরার অন্যান্য আয়াত গুলোও কেয়ামত দিবসের জন্য প্রযোজ্য। কিন্তু ঐ দুই আয়াতের পরে যে সকল আয়াত রয়েছে সেগুলোর দ্বারা কেয়ামত দিবসের ঘটনা বুঝানো যেতে পারে না, বরং এগুলোকে বর্তমান সময়ের বিভিন্ন ঘটনাবলী এবং বিবর্তন সম্বন্ধে সুস্পষ্ট ভবিষ্যদ্বাণী বলাই অধিকতর যুক্তি-সঙ্গত পাহাড়। পর্বতের স্থানান্তর প্রক্রিয়া, যান বহন হিসেবে উটের ব্যবহার বন্ধ হয়ে যাওয়া, পশুর স্তরে মানুষের ক্রমোবনতি, প্রাচীন অধিবাসীদের বর্ণ-বৈষম্যের জন্য পৃথক করে রাখা, সেচ ব্যবস্থা হিসেবে নদ-নদীর বিখণ্ডীকরণ, সমুদ্র-ধারাগুলোকে সংযুক্ত করে দেওয়া (সুয়েজ এবং পানামা খাল দ্বারা), দূর দূরান্ত হতে সমাগত বিভিন্ন জনসমাবেশ

বৃদ্ধি পাওয়া, সামাজিক এবং আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে অধিকতর যোগাযোগ হওয়া, শিশু-হত্যার উপর সামাজিক এবং আইনানুগ নিষিদ্ধকরণ ব্যবস্থা, বই-পুস্তক-সংবাদপত্র এবং সাময়িকীর অত্যন্ত ব্যাপকহারে প্রকাশনা, মহাকাশ সম্বন্ধে অসাধারণ আবিষ্কার এবং জ্ঞান বৃদ্ধি, আধ্যাত্মিক সত্য বিষয়াদি সম্বন্ধে জ্ঞান বৃদ্ধি, ইসলাম এবং পবিত্র কুরআনের অন্তর্নিহিত বিষয়াবলী সম্পর্কে জ্ঞান বৃদ্ধি, বিজ্ঞানের বিভিন্ন ক্ষেত্রে অভূতপূর্ব অগ্রগতি এবং খোদা তা'লার প্রতি ক্রমবর্ধমান ঔদাসীন্য, এবং সর্বশেষে জান্নাতের সন্নিকটবর্তী হওয়া অর্থাৎ আল্লাহতা'লার সন্তুষ্টি এবং অনুমোদনের জান্নাত মোমেনের সন্নিকটবর্তী হওয়া—এই সকল বিষয় কি আমরা বর্তমানে যে যমানায় বাস করছি তার বিভিন্ন নিদর্শন নয়?

সূর্য আচ্ছাদিত হওয়া এবং তারকাগুলো নিষ্প্রভ হয়ে যাওয়াকে কেয়ামত-দিবসের নিদর্শন বলা যেতে পারে—কিন্তু যান-বাহন হিসেবে উটের ব্যবহার পরিত্যাক্ত হওয়ার সঙ্গে কেয়ামতের নিদর্শনের কি সম্পর্ক? পশু-পাখীর একত্রিকরণের সম্পর্ক কি? পানি প্রবাহের বিখণ্ডিত হওয়ার সম্পর্ক কি? সমুদ্রগুলোর সংযুক্ত হওয়ার সম্পর্ক কি? ঐ দিন শিশু কন্যার হত্যা সম্পর্কিত প্রশ্ন উত্থাপনের সম্পর্ক কি? বস্তুতঃপক্ষে এগুলি কেয়ামত দিবসের চিহ্ন হতে পারে না।

ঐ স্বরায় পুনঃ বলা হয়েছে: "এবং লক্ষ্য করো রাত্রিকে যখন উহা অতিক্রান্ত হয় এবং লক্ষ্য করো প্রাতঃকালকে যখন উহা উন্মোচিত হইতে থাকে।" (সুরা তাকভীর: ১৮ এবং ১৯নং আয়াত)।

এই দুটি আয়াতে কেয়ামত দিবসের ঘটনার কথা বুঝানো হয়েছে—এ কথা বলা যেতে পারে না। কারণ কেয়ামত দিবসে দিন রাত্রির পরিক্রমাকে বন্ধ হয়ে যেতে হবে এবং সমগ্র বিশ্বের মধ্যে এক মহা পরিবর্তন সংঘটিত হবে। সুতরাং এই দুটি আয়াত দ্বারা আমাদের বর্তমান যমানার অবস্থাকে বুঝানো হয়েছে। উক্ত আয়াতে অত্যাধিক মাত্রায় পাপ-কর্ম সংঘটিত হওয়া এবং বৈষয়িক উন্নতির চরম শিখরে আরোহণ করা সম্বন্ধে ইশারা করা হয়েছে। অগণিত মানুষ কিভাবে পশুতুল্য জীবন নির্বাহ করবে (যে অবস্থাকে রাত্রির সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে) এবং কালক্রমে কিভাবে আল্লাহতা'লার করুণাসিক্ত সুপ্রভাত তথা সকল সংশয় ও সন্দেহের মূলোপাটন এবং নিশ্চিত বিশ্বাসের পুনর্জীবন লাভ হবে সে সম্বন্ধে রূপকভাবে বর্ণনা দেওয়া হয়েছে।

বস্তুতঃপক্ষে সুরা তাকবীর একটি মাত্র দৃষ্টান্ত যার মধ্যে আমাদের বর্তমান যমানার নিখুঁত চিত্র ভবিষ্যদ্বাণী আকারে পবিত্র কুরআনে উল্লেখ করা হয়েছে। এরূপ আরো অনেক দৃষ্টান্ত রয়েছে—কিন্তু এখানে অধিক আলোচনা করা সম্ভব নয়।

কতকগুলো বিশেষ আধ্যাত্মিক আবিষ্কার:

পবিত্র কুরআন থেকে আরো কতকগুলো বিশেষ আধ্যাত্মিক আবিষ্কারের জন্য হযরত মীর্যা সাহেবের অবদান অনস্বীকার্য। নিচে সংক্ষেপে এরূপ কয়েকটি প্রধান বিষয়ের উল্লেখ করা হলো।

(১) যুক্তি-প্রমাণ সম্পর্কে :—হযরত মীর্যা সাহেবের লেখার মধ্যে যে বিষয়টি পুনঃপুন উল্লিখিত হয়েছে তা হলো এই যে, পবিত্র কুরআনের প্রত্যেকটি প্রতিপাদ্য বিষয়ের মূলে যুক্তি পেশ করা হয়েছে। তাঁর এই আবিষ্কার যেমন গুরুত্বপূর্ণ তেমনি নূতনত্ব এবং সত্যতার দ্বারা মোহরাঙ্কিত—এবং ইহা আমাদের বর্তমান বৈজ্ঞানিক এবং যুক্তিবাদী যুগের বিশেষভাবে পথ নির্দেশক বলে প্রমাণিত হয়েছে। পবিত্র কুরআন উহার কোন পাঠককে বিনা যুক্তি-প্রমাণে কোন কিছু স্বীকার করতে বলে না। অনেক মুসলিম এবং অমুসলিম ভ্রাতা এই বিষয়টির বিপরীত ধ্যান-ধারণা পোষণ করে থাকেন কিন্তু উহা সম্পূর্ণ ভ্রান্তিযুক্ত। পবিত্র কুরআন সকল মানুষকে সেই সেই বিষয়কেই স্বীকার করতে আহ্বান জানায় যা তাদের পর্যবেক্ষণ শক্তি, যুক্তি এবং বিবেকের কাছে সহজেই গ্রহণযোগ্য বলে অনুভূত হয়।

হযরত মীর্যা সাহেব পবিত্র কুরআনের ভিত্তিতে আল্লাহ সম্বন্ধে অখণ্ডনীয় যুক্তি পেশ করেছেন, অহীর সত্যতা সম্বন্ধে এবং ধর্মের বিভিন্ন দিক সম্বন্ধে অকাট্য যুক্তি ও প্রমাণ উপস্থাপন করেছেন। এর ফলশ্রুতিতে যুক্তিপূর্ণ বিশ্বাসের উৎকর্ষ সাধিত হয়েছে, আল্লাহতা'লার উপর বিশ্বাস এবং আল্লাহর রসুল হযরত মুহাম্মদ (সাঃ), ফেরেশতাগণ এবং পবিত্র কুরআনের ঐশী বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে বিশ্বাস দৃঢ়তর হয়েছে। যুক্তি এবং বিশ্বাসের মধ্যস্থিত বিরোধের অবসান হয়েছে। বিজ্ঞান এবং দর্শন-শাস্ত্র আর সেই সকল ব্যক্তিদেক অপ্রস্তুত বা লজ্জিত করতে পারে না যারা হযরত মীর্যা সাহেবের শিক্ষা দ্বারা প্রভাবিত হয়েছে।

আধুনিক শিক্ষার প্রতি আহমদীয়া জামাতের দৃষ্টিভঙ্গি খুবই সহজ এবং যুক্তিসঙ্গত। আধুনিকার শিক্ষার প্রতি এই জামাতের কোন ভয়-ভীতি নাই আহমদীয়া স্কুল এবং কলেজ গুলো এই নীতি অনুসরণ করে থাকে যে, একদিকে বিজ্ঞান এবং দর্শনশাস্ত্র এবং অন্যদিকে ইসলামী ধর্ম বিষয়ক জ্ঞান উভয় সমভাবে গুরুত্বপূর্ণ। এগুলো যেমন ব্যবহারিক জীবনে ধর্মের অনুশাসন মেনে চলার জন্য উৎসাহ দান করে, তেমনিভাবে নতুন নতুন প্রকৃতিক জ্ঞান এবং আবিষ্কার সমূহ সম্বন্ধে আগ্রহ ও উদ্দীপনাসহ অগ্রসর হতে অনুপ্রাণিত করে। ফলতঃ কোন আহমদী যুবককে তার ধর্ম রক্ষার্থে আধুনিক জ্ঞান বিজ্ঞানকে বিসর্জন দিতে হয় না, অথবা আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চার জন্য ধর্মকে জলাঞ্জলি দিতে হয় না।

(২) পবিত্র কুরআনের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে :—আর একটি বিষয় সম্বন্ধে হযরত মীর্যা সাহেব যে শিক্ষা দিয়েছেন তা হলো এই যে, যদি কোন ব্যক্তি পবিত্র কুরআনের কোন একটি বিষয় বুঝতে অসুবিধার সম্মুখীন হয় তাহলে তার সেই অসুবিধার সমাধান পবিত্র কুরআনেই নিহিত রয়েছে—প্রায়ই প্রাসঙ্গিক বিষয়ের কাছেই কোথাও সেই সমাধান দেওয়া হয়েছে

পবিত্র কুরআনের যে সকল বিষয় অসুবিধা এবং সন্দেহপূর্ণ বলে অভিহিত করা হয় সেই সকল বিষয় সম্বন্ধে মীর্যা সাহেব সারা জীবনব্যাপী অতি চমৎকারভাবে সমাধান পেশ করেছেন—কারণ তিনি পবিত্র কুরআন থেকেই ঐ সকল বিষয়ের যথাযথ সদুত্তর প্রদান করেছেন। (ক্রমশঃ)

'দাওয়াত ল আমীর' গ্রন্থের সংক্ষেপিত ইংরেজী সংস্করণ 'Invitation'-এর ধারাবাহিক অনুবাদ : মোহাম্মদ খলিলুর রহমান

সংবাদ

পবিত্র রমজানে তারাবিহ্ ও দরসে কুরআন :

আল্লাহতায়ালার ফজলে প্রতি বৎসরের ন্যায় এবারও পবিত্র রমজানের সিয়াম উপলক্ষে বাংলাদেশের প্রতিটি জামাতে বিশেষ নিয়ম শৃঙ্খলা ও নিষ্ঠার সহিত নামাজ তারাবিহ এবং দরসে কুরআন ও দরসে হাদিসের অনুষ্ঠান পালিত হইতেছে। ঢাকায় আহমদীয়া কেন্দ্রীয় মসজিদে দৈনিক বাদ আসর ইফতারের পূর্ব পর্যন্ত এবং ফজরের নামাজের পর যথাক্রমে কুরআন শরীফ ও হাদিস শরীফের দরস দিতেছেন সদর মুরুব্বী মৌঃ আহমদ সাদেক মাহমুদ সাহেব এবং কেন্দ্রীয় মসজিদ ব্যতীত ঢাকার বিভিন্ন স্থানেও বাকায়দা তারাবীহ্র নামাজ ও তদসঙ্গে সংক্ষিপ্ত দরসে কুরআন অনুষ্ঠিত হইতেছে। তেমনিভাবে চট্টগ্রাম জামাতে রাবওয়া হইতে আগত জনাব মওলানা রাজা নসীর আহমদ সাহেব ১৮ই রমজান পর্যন্ত দৈনিক বাদ আসর ইফতারের পূর্ব পর্যন্ত কুরআন পাকের দরস প্রদান করেন। উক্ত দরসে জামাতের আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা বিশেষ উৎসাহের সহিত যোগদান করেন। উল্লেখযোগ্য, জনাব মওলানা সাহেব আহমদনগরে অনুষ্ঠিত মুয়াল্লেমীন রিফ্রেশার কোর্স ও ট্রেনিং ক্লাশ পরিচালনার পর চট্টগ্রামে অবস্থান করেন। অতঃপর ১৪ই আগষ্ট তিনি ঢাকা হইতে বিমান যোগে করাচী যাত্রা করেন। আল্লাহতায়ালা মওলানা সাহেবের সদা হাফেজ ও নাসের হউন এবং অধিকতর দ্বীনের খেদমত করার তওফিক প্রদান করুন। আমীন।

ব্রাহ্মণবাড়ীয়া মসজিদ মোবারকে বাদ নামাজ আসর মৌঃ সৈয়দ এজায আহমদ সাহেব, সদর মুরুব্বী কুরআন পাকের দরস দিতেছেন। তেমনিভাবে বিভিন্ন জামাতে নিয়োজিত মুরুব্বী ও মুয়াল্লেম সাহেবান বিশেষ গুরুত্ব সহকারে উক্ত দরস প্রদান করিতেছেন। আল্লাহতায়ালা জামাতের সকলকে কুরআন শরীফের দরস সমূহে যোগদান করিয়া পূর্ণরূপে উপকৃত হওয়ার তওফিক দিন ও সিয়ামের যাবতীয় কল্যাণে ভূষিত করুন এবং এই পবিত্র মাসের অন্যান্য সকল এবাদত পালন এবং বিশেষ ভাবে দোওয়া করার তওফিক দিন। আমীন।

(আহ্মদী রিপোর্ট)

সন্তান তওল্লদ

পাবনা জেলার চরধাপারী জামাতের সেক্রেটারী জনাব মিজানুর রহমান সাহেবকে আল্লাহতায়ালা ২০শে জুন তারিখে প্রথম কন্যা সন্তান দান করেন। সকলের নিকট দোওয়ার আবেদন যেন আল্লাহতায়ালা নবজাতকে সুস্থ ও কল্যাণময় দীর্ঘায়ু দান করেন।

জরুরী এলান

আহমদী পত্রিকার গ্রাহক ভ্রাতা ও ভগ্নিগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া জানানো যাইতেছে যে বার বার অনুরোধ জানানো সত্বেও কেহ কেহ দীর্ঘ দিন যাবৎ পত্রিকার চাঁদা আদায় করিতেছেন না। এমতাবস্থায় অত্র এলান মারফত তাঁহাদিগকে পুনঃরায় এই ব্যাপারে আশু দৃষ্টি দানের জন্য বিশেষ অনুরোধ করা হইতেছে নতুবা তাঁহাদের পত্রিকা পাঠানো বন্ধ করা ছাড়া কোন উপায় থাকিবে না।

এই ব্যাপারে তাঁহাদিগকে ১ মাস সময় দেওয়া হইল। উক্ত সময়ের মধ্যে চাঁদা অনাদায়ে পুনরায় ব্যক্তিগতভাবে কোন যোগাযোগ ছাড়াই পত্রিকা পাঠানো বন্ধ করিয়া দেওয়া হইবে এবং এই জন্য গ্রাহক নিজেই দায়ী থাকিবেন।

ম্যানেজার বাঃ আঃ আঃ

শুভ বিবাহ

(১)

ছোট লাদিয়া নিবাসী জনাব আব্দুস শহিদ সাহেবের দ্বিতীয়া কন্যা মোহাম্মৎ আনোয়ারা বেগমের সহিত নাটাই নিবাসী মরহুম আবদুর রৌফ সাহেবের এক মাত্র ছেলে মোহাম্মদ মোমতাজ উদ্দিন সাহেবের শুভ বিবাহ ১০,০০১/- টাকা দেন মোহর ধার্যে ১৩ই জুলাই ১৯৭৯ইং তারিখে রোজ শুক্রবার বাদ জুমা ব্রাহ্মণবাড়িয়াস্থ মসজিদ মোবারকে সুসম্পন্ন হয়। বিবাহ পড়ান মৌঃ ফারুক আহমদ সাহেব, সদর মুরুব্বী। উক্ত বিবাহ অনুষ্ঠানে জামাতের অনেক গন্য-মান্য ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। উক্ত বিবাহ বা-বরকত হওয়ার জন্য সকল ভ্রাতা এবং ভগ্নির নিকট দোওয়ার আবেদন জানানো যাইতেছে। প্রকাশ থাকে যে, জনাব আব্দুস শহিদ সাহেব বিবাহ উপলক্ষ্যে এসাতে ইসলামের জন্য ৩০.০০ টাকা নাজরানা দিয়াছেন।

(২)

৩রা আগষ্ট ১৯৭৯ইং তারিখে ঢাকা আহমদীয়া কেন্দ্রীয় মসজিদে জুমার নামাজ আদায়ের পর আহমদীপাড়া, ব্রাহ্মণবাড়ীয়া নিবাসী জনাব মুতিউর রহমান সাহেবের কন্যা মুসাম্মাত খালেদা বেগমের সহিত নারায়ণগঞ্জ নিবাসী মরহুম জনাব হাবিবুল্লাহ সিকদার সাহেবের তৃতীয় পুত্র জনাব মোঃ মাহবুবুল্লাহ সিকদারের বিবাহ ১০,০০১ (দশ হাজার এক) টাকা দেন মোহর ধার্যে সুসম্পন্ন হয়। বিবাহের খোৎবা প্রদান করেন মৌঃ আহমদ সাদেক মাহমুদ, সদর মুরুব্বী এবং মোহতারম আমীর সাহেব, বাংলাদেশ আঞ্জুমানে আহমদীয়া ইজতেমায়ী দোওয়া করান। উক্ত বিবাহ সর্বাঙ্গীনরূপে বাবরকত হওয়ার জন্য সকল ভ্রাতা ও ভগ্নির নিকট খাসভাবে দোওয়ার আবেদন জানানো যাইতেছে।

নাইজেরীয়ার আবাদান শহরে আহমদীয়া মসজিদ ছয় সপ্তাহের মধ্যে সম্পন্ন

উদ্বোধন অনুষ্ঠানের সময় দশ ব্যক্তির বয়েত গ্রহণ

নাইজেরিয়ার শহর আবাদানে ইনফানী জোনের জন্য একটি সুন্দর মসজিদের উদ্বোধন ১লা এপ্রিল ১৯৭৯ ইং অনুষ্ঠিত হয়। ইহার ভিত্তিপ্রস্তর রাখিয়া ছিলেন আল-হাজ্জ আর, এ, বিসারী, চেয়ারম্যান; আবাদান সার্কিট। এই প্রসঙ্গে বিশেষ উল্লেখযোগ্য যে, এই মসজিদ নির্মাণকার্য মাত্র ছয় সপ্তাহের মধ্যে সুসম্পন্ন হয়। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন আনসারুদ্দীন সোসাইটির একজন বিশিষ্ট সদস্য আল-হাজ্জ জে, ও, উডেসিনিয়া। তিনি ফিতা কাটিয়া এই বক্তব্য রাখেন যে আজ হইতে এই মসজিদ একক ও অদ্বিতীয় খোদা-তায়ালার প্রত্যেক এবাদতকারীর জন্য উন্মুক্ত। এই উপলক্ষে তিনি তাঁহার বক্তৃতায় জামাত আহমদীয়ার উদ্যোগ ও প্রচেষ্টা সমূহের ভূয়সী প্রশংসা করেন। এবং সর্বসাধারণ মুসলমান দিগকে জোর দিয়া বলেন, তাহারা যেন জামাত আহমদীয়ার সহিত সহযোগিতা করেন।

এই উপলক্ষে অনুষ্ঠানের আকর্ষণীয় বিষয়ালীর মধ্যে ছিল দশজন ব্যক্তির বয়েত করিয়া আহমদীয়া সেলসেলায় দাখিল হওয়া। এই উপলক্ষে মেহমানগণ এবং জামাত আহমদীয়ার সদস্যগণ মসজিদের জন্য মুক্ত হস্তে দান করেন। (ইংরেজী সপ্তাহিক "ট্রুথ", নাইজেরিয়া, ৮ই জুন, ১৯৭৯ইং)

নাইজেরীয়ার একজন চীফকে পবিত্র কুরআন তোহফা প্রদান

নাইজেরীয়ার 'ওইউ' ষ্টেটের এলিশা শহরের চীফকে কিছুদিন পূর্বে জামাত আহমদীয়ার সদস্য বৃন্দের পক্ষ হইতে ইউরোবা ভাষায় তর্জমাকৃত কুরআন করীমের এক কপি তোহফা স্বরূপ পেশ করা হয়। এই তোহফা উক্ত শহরে আহমদীয়া মসজিদের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনের পর মুবাল্লেগ ও আমীরে-জামাত মহতারম এম, এ, শাহেদ পেশ করেন। সম্মানিত চীফ সাহেব উক্ত তোহফাটিকে তাঁহার জন্য অসাধারণ কল্যাণ ও সৌভাগ্যের কারণ বলিয়া অভিহিত করেন এবং তাঁহাদের শহরে আহমদীয়া মসজিদ নির্মাণে স্বতঃস্ফূর্ত আনন্দ প্রকাশ করেন। তিনি দোওয়া করেন, আল্লাহতায়ালা যেন জামাত আহমদীয়ার উপর অধিকতর স্বীয় বরকত ও কল্যাণ অবতীর্ণ করেন। আমীন। (ইংরেজী সাপ্তাহিক 'ট্রুথ; ৮ই জুন ১৯৭৯ লেগোস, নাইজেরিয়া)

— অনুবাদ: মৌঃ আহমদ সাদেক মাহমুদ

পবিত্র রমজান ও আর্থিক কুরবানীর গুরুত্ব

তাহ্রীকে জদীদ ও ওয়াক্ফে জদীদের চাঁদা এই মাসে সম্পূর্ণ পরিশোধ করা শ্রেয়।

পবিত্র রমজান মাস মুমিনদের জন্য অনন্ত বরকত ও রহমত লইয়া উপস্থিত হয়। এই মাস এবাদত নেকী, কুরবানী এবং দোওয়ার কবুলিয়তের মাস। হযরত রসুল করীম (সাঃ আঃ) এই মাসে সর্বপ্রকার এবাদত ব্যতীত আল্লাহতায়ালার পথে দান খয়রাতে এমনভাবে আত্মনিয়োগ করিতেন যেমন প্রবলবেগে ঝঞ্ঝা বায়ু প্রবাহিত হয়। (আল-হাদিস)

এ প্রসঙ্গে আহমদী ভ্রাতা ও ভগ্নিদের দৃষ্টি বিশেষভাবে এ বিষয়ের দিকে আকৃষ্ট করা হইতেছে—তাঁহারা যেন প্রতি বৎসরের ন্যায় এবারও রমজানের মধ্যেই তাহরীকে জদীদ ও ওক্ফে জদীদের চাঁদা সম্পূর্ণ পরিশোধ করিতে যত্নবান হন যাহাতে তাঁহারা সেই বরকত পূর্ণ দোওয়ায় তালিকাভুক্ত হওয়ার সৌভাগ্য লাভ করেন, যাহা ২৯শে রমযানের বিশেষ দোওয়ার জন্য সৈয়দনা হযরত খলিফাতুল মসীহ সালেস (আইঃ)-এর নিকট পেশ করা হয়

—সেক্রেটারী তাহরীকে জদীদ ও ওকফে জদীদ

হযরত ইমাম মাহদী মসীহ মওউদ (আঃ) কর্তৃক প্রবর্তিত বয়াত (দীক্ষা) গ্রহনের দশ শর্ত

বয়াত গ্রহণকারী সর্বান্তকরণে অঙ্গীকার করিবে যে,—

(১) এখন হইতে ভবিষ্যতে কবরে যাওয়া পর্যন্ত শির্‌ক (খোদাতায়ালার অংশীবাদীতা) হইতে পবিত্র থাকিবে।

(২) মিথ্যা, পরদার গমন, কামলোলুপ দৃষ্টি, প্রত্যেক পাপ ও অবাধ্যতা, জুলুম ও খেয়ানত, অশান্তি ও বিদ্রোহের সকল পথ হইতে দূরে থাকিবে। প্রবৃত্তির উত্তেজনা যত প্রবলই হউক না কেন তাহার শিকারে পরিণত হইবে না।

(৩) বিনা ব্যতিক্রমে খোদা ও রসুলের হুকুম অনুযায়ী পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়িবে, সাধ্যানুসারে তাহাজ্জুদের নামায পড়িবে, রসুলে করীম সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়া সাল্লামের প্রতি দরুদ পড়িবে, প্রত্যহ নিজের পাপ সমূহের ক্ষমার জন্য আল্লাহতায়ালার নিকট প্রার্থনা করিবে ও এস্তেগফার পড়িবে এবং ভক্তিপ্লুত হৃদয়ে, তাঁহার অপার অনুগ্রহ স্মরণ করিয়া তাঁহার হাম্‌দ ও তারিফ (প্রশংসা) করিবে।

(৪) উত্তেজনার বশে অন্যায়রূপে, কথায়, কাজে, বা অন্য কোন উপায়ে আল্লাহর সৃষ্ট কোন জীবকে, বিশেষতঃ কোন মুসলমানকে কোন প্রকার কষ্ট দিবে না।

(৫) সুখে-দুঃখে, কষ্টে-শান্তিতে, সম্পদে-বিপদে সকল অবস্থায় খোদাতায়ালার সহিত বিশ্বস্ততা রক্ষা করিবে। সকল অবস্থায় তাঁহার সাথে সন্তুষ্ট থাকিবে। তাঁহার পথে প্রত্যেক লাঞ্ছনা-গঞ্জনা ও দুঃখ-কষ্ট বরণ করিয়া লইতে প্রস্তুত থাকিবে, এবং সকল অবস্থায় তাঁহার ফায়সালা মানিয়া লইবে। কোন বিপদ উপস্থিত হইলে পশ্চাদপদ হইবে না, বরং সম্মুখে অগ্রসর হইবে।

(৬) সামাজিক কদাচার পরিহার করিবে। কুপ্রবৃত্তির অধীন হইবে না। কোরআনে অনুশাসন ষোলআনা শিরোধার্য করিবে, এবং প্রত্যেক কাজে আল্লাহ ও রসুলে করীম সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়া সল্লামের আদেশকে জীবনের প্রতি ক্ষেত্রে অনুসরণ করিয়া চলিবে।

(৭) ঈর্ষা ও গর্ব সর্বোতভাবে পরিহার করিবে। দীনতা, বিনয়, শিষ্টাচার ও গাম্ভীর্যের সহিত জীবন-যাপন করিবে।

(৮) ধর্ম ও ধর্মের সম্মান করাকে এবং ইসলামের প্রতি আন্তরিকতাকে নিজ ধন-প্রান, মান-সম্ভ্রম, সন্তান-সন্ততি ও সকল প্রিয়জন হইতে প্রিয়তর জ্ঞান করিবে।

(৯) আল্লাহতায়ালার প্রীতি লাভের উদ্দেশ্যে তাঁহার সৃষ্ট-জীবের সেবায় যত্নবান থাকিবে, এবং খোদার দেওয়া নিজ শক্তি ও সম্পদ যথাসাধ্য মানব কল্যাণে নিয়োজিত করিবে।

(১০) আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে ধর্মানুমোদিত সকল আদেশ পালন করিবার প্রতিজ্ঞায় এই অধমের (অর্থাৎ হযরত মসীহ মওউদ আলাইহিস্‌ সালামের) সহিত ভ্রাতৃত্ব বন্ধনে আবদ্ধ হইল, জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তাহাতে অটল থাকিবে। এই ভ্রাতৃত্ব বন্ধন এত বেশী গভীর ও ঘনিষ্ট হইবে যে, দুনিয়ার কোন প্রকার আত্মীয় সম্পর্কের মধ্যে

আহ্‌মদীয়া জামাতের

ধর্ম-বিশ্বাস

আহ্‌মদীয়া জামাতের প্রতিষ্ঠাতা হযরত মসীহ্ মওউদ (আঃ) তাঁহার "আইয়ুস সুলেহ্" পুস্তকে বলিতেছেন :

"যে পাঁচটি স্তম্ভের উপর ইসলামের ভিত্তি স্থাপিত, উহাই আমার আকিদা বা ধর্ম-বিশ্বাস। আমরা এই কথার উপর ঈমান রাখি যে, খোদাতায়ালা ব্যতীত কোন মা'বুদ নাই এবং সাইয়েদেনা হযরত মোহাম্মাদ মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম তাঁহার রসুল এবং খাতামুল আম্বিয়া (নবীগণের মোহর)। আমরা ঈমান রাখি যে, ফেরেশ্‌তা, হাশর, জান্নাত এবং জাহান্নাম সত্য এবং আমরা ঈমান রাখি যে, কুরআন শরীফে আল্লাহ্‌তায়ালা যাহা বলিয়াছেন এবং আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম হইতে যাহা বর্ণিত হইয়াছে উল্লিখিত বর্ণনানুসারে তাহা যাবতীয় সত্য। আমরা ঈমান রাখি, যে ব্যক্তি এই ইসলামী শরীয়ত হইতে বিন্দু মাত্র কম করে, অথবা যে বিষয়গুলি অবশ্য-করণীয় বলিয়া নির্ধারিত, তাহা পরিত্যাগ করে এবং অবৈধ বস্তুকে বৈধ করণের ভিত্তি স্থাপন করে, সে ব্যক্তি বে-ঈমান এবং ইসলাম বিদ্রোহী। আমি আমার জামাতকে উপদেশ দিতেছি যে, তাহারা যেন শুদ্ধ অন্তরে পবিত্র কলেমা 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রসুলুল্লাহ্'-এর উপর ঈমান রাখে এবং এই ঈমান লইয়া মরে। কুরআন শরীফ হইতে যাহাদের সত্যতা প্রমাণিত, এমন সকল নবী (আলাইহেমুস সালাম) এবং কেতাবের উপর ঈমান আনিবে। নামায, রোযা, হজ্জ ও যাকাত এবং এতদ্ব্যতীত খোদাতায়ালা এবং তাঁহার রসুল কর্তৃক নির্ধারিত যাবতীয় কর্তব্য সমূহকে প্রকৃতপক্ষে অবশ্য করণীয় মনে করিয়া এবং যাবতীয় নিষিদ্ধ বিষয় সমূহকে নিষিদ্ধ মনে করিয়া সঠিকভাবে ইসলাম ধর্মকে পালন করিবে। মোট কথা, যে সমস্ত বিষয়ের উপর আকিদা ও আমল হিসাবে পূর্ববর্তী বুজুর্গানের 'এজমা' অথবা সর্ববাদি-সম্মত মত ছিল এবং যে সমস্ত বিষয়কে আহলে সুন্নত জামাতের সর্ববাদী-সম্মত মতে ইসলাম নাম দেওয়া হইয়াছে, উহা সর্বতোভাবে মান্য করা অবশ্য কর্তব্য। যে ব্যক্তি উপরোক্ত ধর্মমতের বিরুদ্ধে কোন দোষ আমাদের প্রতি আরোপ করে, সে তাকওয়া এবং সততা বিসর্জন দিয়া আমাদের বিরুদ্ধে মিথ্যা অপবাদ রটনা করে। কেয়ামতের দিন তাহার বিরুদ্ধে আমাদের অভিযোগ থাকিবে যে, কবে সে আমাদের বুক চিরিয়া দেখিয়াছিল যে, আমাদের এই অঙ্গীকার সত্ত্বেও অন্তরে আমরা এই সবের বিরোধী ছিলাম?

"আলা ইন্না লা'নাতাল্লাহে আলাল কাফেরীনাল মুফতারিয়ীন"

অর্থাৎ, সাবধান নিশ্চয়ই মিথ্যা রটনাকারী কাফেরদের উপর আল্লাহ্‌র অভিশাপ।"

(আইয়ামুস সুলেহ্, পৃঃ ৮৬-৮৭)

Published & Printed by Md F. K. Mollah, at Ahmadiyya Art Press,
for the proprietors, Bangladesh Anjuman e Ahmadiyya.
4, Bakshibazar Road, Dacca—1
Phone No. 283635
Editor : A. K. Muhammad Ali Anwar